ছেলেদের বিদ্যাসাগর

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্
এলাহাবাদ
১৯২৫

মূল্য ॥৵০ দশ আনা

প্রকাশক :—
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্
এলাহাবাদ।

প্রিণ্টার :—
শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

ভূমিকা

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

এই 'ছেলেদের বিদ্যাসাগরের' শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় আমাকে তাঁহার এই গ্রন্থের একটু ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এমন সুলিখিত, সুন্দর গ্রন্থের ভূমিকার কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে মহাপুরুষের জীবন-কথা লেখক মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেও লোকে, বিশেষতঃ বালকেরা পড়িত; বর্ত্তমান গ্রন্থকার 'যেমন-তেমন' করিয়া লেখেন নাই; তিনি অতি সরল ও মনোরম ভাষায়, সুনিপুণ চিত্রকরের মত এবং, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন— পরম ভক্তিভরে ছেলেদের জন্য এই 'বিদ্যাসাগর' লিখিয়াছেন; সুতরাং ইহা যে আমাদের দেশের বালক-বালিকাগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই।

নিবেদন

সত্য সত্যই যাঁরা বড় মানুষ, তাঁদের কথা কখনো পুরাণো হয় না,—তাঁদের স্মৃতি যুগ-যুগ ধরে লোকে পূজা করে। তাই, অনেক দিনের কথা হলেও, বিদ্যাসাগরের মতো একজন বড় মানুষের কথা দেশের ছেলেমেয়েদের শোনাবার উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতি-পূজা করে ধন্য হয়েছি।

দিল্লী বঙ্গসাহিত্য-সভা,
বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

উৎসর্গ

মায়ের চরণে



The Indian Press, Ltd.
Benares.

বিদ্যাসাগরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

ছেলেদের

বিদ্যাসাগর

গোড়ার কথা

তোমাদের ভেতর যারা কল্‌কাতায় থাকো, গোলদীঘিতে বেড়াতে গেলেই দেখ্‌তে পাও, চারদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা, মার্ব্বেল পাথরের উঁচু বেদীর উপর ধব্‌ধবে সাদা একটি মূর্ত্তি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন। কেমন সাদাসিদে ধরণ এই মূর্ত্তিটির! মাথাটির অর্দ্ধেক একেবারে নেড়া, গায়ে শুধু একখানি চাদর জড়ানো। এই মূর্ত্তিটি যাঁর, তাঁকে এদেশের সকলেই চেনে। তোমরাও চেনো। মূর্ত্তিটি যদি বা না দেখে থাকো, এঁর ছবি নিশ্চয় দেখেছ—এঁর বইও পড়েছ নিশ্চয়। অ আ ই ঈ,

ক খ গ ঘ এ-সব কে আর পড়নি বলো? এখন বুঝ্‌তে পারছো বোধ হয়, কোন্ বইখানির কথা আমি বল্‌ছি। মনে পড়্‌ছে সেই পড়া—

বড় গাছ।
ভাল জল।
লাল ফুল।
ছোট পাতা।

তার পরেই আছে—

পথ ছাড়।
জল খাও।
হাত ধর।
বাড়ী যাও।

কেমন, মনে পড়্‌ছে তো? সেই—নূতন ঘটী, পুরাণ বাটী, কাল পাথর? এর মধ্যেই তোমরা সে-সব ভুলে যাওনি নিশ্চয়। এ বই তোমরাও পড়েছ, আর তোমাদের বাবা, জ্যাঠা, এমন কি ঠাকুরদাদারাও পড়েছেন। এই বই যাঁর, ঐ মূর্ত্তিটিও তাঁরই। এঁর কথাই আজ তোমাদের শোনাব। এঁর নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তোমাদের যেমন কারো পদবী 'চট্টোপাধ্যায়', কারো 'মুখোপাধ্যায়', কারো 'ঘোষ', কারো বা দত্ত,—'বিদ্যাসাগর'

কিন্তু তেমন কোন পদবী নয়। এটি হোল একটি উপাধি। বিদ্যায় তিনি খুব বড় ছিলেন বলেই তাঁর এই উপাধি হয়েছিল। তোমরা হয়তো শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন মোটে ২১ বছর, তখন তিনি সংস্কৃতের যত সব বড় বড় আর কঠিন কঠিন বই শেষ করে ফেলে, পরীক্ষায় সকলের উপর হয়ে এই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়ে ছিলেন। এই উপাধি আরো অনেকে পেয়েছেন, কিন্তু শুধু 'বিদ্যাসাগর' বল্‌লে আর কোন বিদ্যাসাগরকে না বুঝিয়ে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বোঝায়। তিনি এত বড় বিদ্বান ছিলেন যে, বড়লাট পর্য্যন্ত তাঁকে মান্য করতেন। দেশের লোকের তো কথাই নেই। দেশের লোক তো তাঁকে দেবতার মতোই ভক্তি করতো। শুধু যে তিনি বিদ্বান ছিলেন তা নয়, তাঁর শরীরে দয়ামায়া এত বেশী ছিল যে, সে-রকম আর দেখা যায় না। তিনি নিজে না খেয়ে, ভাল না পরে লোকের কষ্ট দূর করতেন। কারো কলেরা হয়েচে, রাস্তায় পড়ে ছট্‌পট্ করচে, তিনি অম্‌নি ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিতেন, আর সেবা-যত্ন করতেন। কেউ বিপদে পড়েচে, অমনি যেচে গিয়ে তাকে বিপদ থেকে বাঁচাতেন। এই রকম করে লোকের তিনি উপকার করতেন। সেজন্যে সকলে তাঁকে "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" বল্‌তো—এখনো

পর্য্যন্ত বলে থাকে। তোমাদের অনেকেরই মতো তিনি ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তেন, আর ভারী গরীব ছিলেন ; এত গরীব ছিলেন যে, যখন তিনি দেশ থেকে তাঁর বাপের সঙ্গে কল্‌কাতায় পড়তে এলেন, তখন তাঁকে ৫২ মাইল পথ সবটাই প্রায় হেঁটে আস্‌তে হয়েছিল। তখন তিনি একেবারেই ছেলে-মানুষ—বয়স সবে ৯ বছর।

তাঁর ছেলেবেলার কথা, লেখাপড়ার কথা, কাজ-কর্ম্মের কথা, এমনি চমৎকার যে, শুন্‌তে বস্‌লে তোমরা একেবারে নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে যাবে। সেই সকল কথা তোমাদের একে একে বল্‌ছি, কিন্তু তার আগে তাঁর বাপ-ঠাকুরদার কথা বলি।

ঈশ্বরের ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ একটি লোকের মতো লোক ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুর গ্রামে। তিনি ঝগড়া-ঝাটি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। অন্য ভাইদের সঙ্গে বিষয় নিয়ে মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। তাঁর নিজেরই যখন ভাইদের সঙ্গে বনিবনাও হোল না, তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভাইদের বনিবনাও আর কেমন করে হবে। স্ত্রী দুর্গাদেবী স্বামীর ভিটেয় না থাকৃতে পেরে বীরসিংহ গ্রামে বাপের বাড়ীতে গিয়ে রইলেন। কিন্তু দুঃখ-

কষ্ট সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো। এখানেও সবাই তাঁকে দূর-ছাই করতে লাগ্‌লো। অনেক দিন পরে তর্কভূষণ মশাই দেশে ফিরে এসে দেখ্‌লেন, তাঁর স্ত্রী ছুটি ছেলে আর চারটি মেয়ে নিয়ে আলাদা ভাবে একখানি কুঁড়ে ঘরে আছেন আর চরকায় সূতো কেটে অনেক কষ্টে তাঁদের দিন চল্‌ছে। ভাইদের গুণের কথা শুনে তিনি পৈতৃক ভিটে ছেড়ে দিয়ে বীরসিংহ গ্রামেই রইলেন। তিনি গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল অতি মহৎ। কিছুতেই তিনি কারো অনাদর বা অপমান সহ্য করতে পারতেন না। উপকার লাভের আশায় কারো খোসামোদ করা তাঁর অভ্যেস ছিল না। নিজে যা ভাল বুঝ্‌তেন, তাই তিনি করতেন, কারো কথায় মত বদ্‌লাতেন না। গরীব হলেও বড় লোকের অনুগ্রহ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি স্পষ্ট কথা বল্‌তেন। কেউ রাগ করবে বা অসন্তুষ্ট হবে বলে স্পষ্ট কথা বল্‌তে তিনি ভয় পেতেন না। যে-সব লোকের ভেতরে এক—বাইরে আর, তাদের সঙ্গে তিনি পারতপক্ষে ভাব করতেন না। ব্যবহারে যারা ভদ্র নয়, তারা ধনী, বিদ্বান আর ক্ষমতাবান হলেও তাদের তিনি ভদ্র লোক বলে মনে করতেন না। এর পর তোমরা দেখ্‌বে, ঈশ্বর তাঁর ঠাকুরদার এই সব গুণই পেয়েছিলেন।

তর্কভূষণ মশায়ের গায়ের জোরও অসাধারণ রকমের ছিল। তিনি বাঘ-ভালুকের সাম্‌নে এগুতেও ভয় পেতেন না। এ-সম্বন্ধে একটি গল্প বলি।

একদিন তিনি বীরসিংহ থেকে মেদিনীপুরে যাচ্ছেন—পথে এক ভালুকের সঙ্গে দেখা। ভালুককে দেখেই তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। ভালুক কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়—যাকে বলে নাছোড়বান্দা তাই আর কি! ভালুকটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে গাছের কাছে এসে, গাছটার দুদিক দিয়ে দুটো হাত বাড়ালো—তাঁকে ধরবার জন্যে। যেই হাত বাড়ানো, তর্কভূষণ অমনি তার দুটো হাত দুদিক থেকে দুহাতে খুব শক্ত করে ধরে তাকে গাছের গায় ঘষ্‌ড়াতে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ এই রকম ঘষ্‌ড়ানির চোটে ভালুক ভায়া একেবারে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে গেল। তিনি মনে করলেন ভালুকটা মরে গেছে। তখন তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ছেড়ে দিয়ে যেই দু-এক পা এগিয়েছেন, অমনি দুষ্ট ভালুকটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘাঁৎ-ঘাঁৎ করে তাঁকে থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরলে। থাবার ধারাল নখগুলো তাঁর গায়ে বসে গেল; কিন্তু তর্কভূষণ মশাইয়ের হাতে ছিল একটা লোহার ডাণ্ডা, অমনি টাই করে ভালুকটার নাকের উপরে বসিয়ে দিলেন জোরে তারই এক ঘা।



The Indian Press, Ltd., Benares-Branch

৺হরিকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ এক ঘা খেয়েই ভালুকটা ঘুরে পড়ে গেল। তার উপর আর এক ঘা—আর এক ঘা। এই রকম কয়েক ঘায় ভালুকের দফা নিকেশ করে দিয়ে চলে গেলেন।

ঈশ্বরের বাপ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বড় যে-সে লোক ছিলেন না। তর্কভূষণ মশাই যখন সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান, তখন দুর্গাদেবীর কি কষ্ট! সে-সময় ঠাকুরদাসের বয়স চোদ্দ পনর বছর। মায়ের কষ্ট দূর করবার জন্যে তিনি রোজগারের চেষ্টায় সেই বয়সেই কল্‌কাতা যান। ইংরাজী শিখ্‌তে পারলে সাহেবদের হৌসে ভাল চাকরী জুটতে পারবে এই ভরসায় তিনি রোজ সন্ধ্যেবেলায় এক জনের বাড়ীতে ইংরাজী শিখ্‌তে যেতেন। যখন ফিরতেন, তখন বাসার উপরি লোকের খাওয়া-দাওয়ার কাণ্ড শেষ হয়ে যেতো, কাজেই রাত্রে তাঁকে উপোস্‌ করে কাটাতে হোত। কখন কখন এমন হোত যে, সমস্ত দিন তাঁর অন্ন জুটতো না। এক দিনের কথা বলি। বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তখনো পর্য্যন্ত তাঁর কিছুই খাওয়া হয় নি। ঘরে বসে থাক্‌লে ক্ষিদের জ্বালা বাড়ে। ক্ষিদে ভোল্‌বার জন্যে তিনি বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁর হাত-পা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে লাগ্‌লো, মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো—আর তিনি চল্‌তে পারেন না।

অনেক কষ্টে একটা দোকানের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। সেই দোকানে একটি স্ত্রীলোক বসে মুড়ী-মুড়কী বেচ্‌ছিলেন। একটি ছেলেকে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "অমন করে দাঁড়িয়ে কেন বাছা, কি হয়েছে তোমার?" ঠাকুরদাস বল্‌লেন, "তেষ্টা পেয়েছে।" তখন স্ত্রীলোকটি তাঁকে আদর করে ডেকে দোকানের ভেতর বসিয়ে কিছু মুড়কী আর এক ঘটি জল দিলেন। ঠাকুরদাসের তখন ভারী ক্ষিদে। মুড়কীগুলি তিনি যে-রকম করে খেতে লাগ্‌লেন, তা দেখে স্ত্রীলোকটি বুঝে নিলেন ব্যাপার কি। জিজ্ঞাসা করলেন "এখনো বুঝি তুমি কিছুই খাওনি?" এই কথায় ঠাকুরদাসের চোখ্ ছল্‌ছল্ করে উঠ্‌লো। তিনি বল্‌লেন, "না মা, এখনো পর্য্যন্ত আমি কিছুই খাই নি।" স্ত্রীলোকটি তখন তাড়াতাড়ি দই কিনে এনে তাঁকে পেট ভরে ফলার করালেন, আর বলে দিলেন, যে-দিন তাঁর খাওয়া না হবে, সে-দিন তিনি তাঁর কাছে এসে ফলার করে যাবেন।

এই রকম কষ্টে কিছু ইংরাজী শিখে তিনি দু-টাকা মাইনের একটি চাকরী পান। তাঁর বয়স যখন তেইশ-চব্বিশ বছর, তখনো তাঁর মাইনে খুব সামান্য—আট টাকা মাত্র। তার পর ভগবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই ভগবতী দেবীই হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জননী। ভগবতী দেবীর

গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। ছোট বেলা থেকেই তিনি এমন শান্ত-শিষ্ট আর ধীর ছিলেন যে, সে-রকম বড় দেখা যায় না। কারো কোন কষ্ট দেখ্‌লে তাঁর দু-চোখ দিয়ে জল পড়্‌তো। খেলাধূলোর চেয়ে তিনি লোকজনকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, গরীব-দুঃখীদের কষ্ট দূর করতেই ভালবাসতেন—এমনিই তিনি দয়াময়ী। তাঁর বাপ ছিলেন গরীব, তার উপর আবার শবসাধনা করতে গিয়ে পাগল হয়ে যান। এই-সব কারণে ভগবতী দেবী মামার বাড়ীতেই মানুষ হন। ছোট বেলাতেই ভগবতী দেবীর প্রশংসায় গ্রাম-পল্লী ভরে গিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গরীবের ঘরে জন্মালে কি হয়! তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন ঋষির মতো—বাপ ছিলেন পুণ্যবান, সেই জন্যেই তো তিনি অত গুণশালী হয়েছিলেন। তাঁর মা ছিলেন দয়াময়ী—তিনিও সেইজন্যে দয়াময় হয়েছিলেন। ভগবতী দেবীর গুণের কথা ভাল করে তোমাদের পরে শোনাব। এখন ঈশ্বরের কথাই হোক্‌।

ছেলেবেলার কথা

ইংরাজী ১৮২০ সালে মেদিনীপুরের এই বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর জন্ম-সময়ের একটি মজার গল্প আছে। তাঁর বাপ ঠাকুরদাস হাটে জিনিষপত্র কিন্‌তে গেছ্‌লেন। তিনি বাড়ী ফিরছেন, এমন সময় তাঁর ঠাকুরদা এগিয়ে গিয়ে তাঁর বাপকে বল্‌লেন, "ঠাকুরদাস, আজ আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" ঠাকুরদাস তাই শুনে গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছিলেন—এঁড়ে বাছুরটিকে দেখ্‌বার জন্যে। ঠাকুরদা হেসে বল্‌লেন, "ওদিকে নয়, এদিকে এস", এই বলে তাঁকে আঁতুড়-ঘরে নিয়ে গিয়ে শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন, আর বল্‌লেন, "এ ছেলে এঁড়ের মতোই একগুঁয়ে হবে, আর আমার বংশের মুখ রাখ্‌বে।" এই কথা তিনি কেমন করে বলেছিলেন বল্‌তে পারি নে, কিন্তু তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছ্‌লো।

তোমরা যেমন অনেকে পাঁচ বছর বয়সে পড়া স্নুরু করেছিলে, ঈশ্বরও তাই করেছিলেন। তবে সে অনেকদিন

আগেকার কথা কিনা! তখন পাড়াগাঁয়ে ইস্কুলও ছিল না, ইংরাজী পড়ানও হোতো না। তখন শুধু পাঠশালা ছিল, আর একজন করে গুরুমশায় ছেলেদের কেবল বাঙ্গালা লেখাপড়া শেখাতেন। ঈশ্বর গিয়ে গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু তখন তিনি ভারী দুরন্ত ছিলেন। পাঠশালায় ঢুক্‌লে তাঁর লেখাপড়ার বুদ্ধিটি যেমন খেল্‌তো, পাঠশালা থেকে বেরুলে দুষ্টমির বুদ্ধিও তেমনি তুখড় হয়ে উঠ্‌তো। পাড়ার লোকের বাগানে ঢুকে চুপি চুপি ফল পেড়ে খাওয়া, কেউ কাপড় শুখুতে দিয়েচে, অমনি পা টিপে টিপে গিয়ে সেই কাপড়ে ময়লা লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসা, লোকের দাওয়ায় উঠে সে জায়গা নোংরা করে রেখে আসা, ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানের শীষ ছিঁড়ে নষ্ট করা—এই রকম সব দুষ্টমির জ্বালায় পাড়ার লোক, গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠ্‌তো। গুরুমশায় কিন্তু ঈশ্বরকে এজন্যে কিছুই বল্‌তেন না। কারণ লেখাপড়ায় ঈশ্বর খুব ভাল ছিলেন। খুব কম সময়ের ভেতর তাঁর পড়া হয়ে যেতো। যা তিনি একবার দেখ্‌তেন, তাই শিখে ফেল্‌তেন, যা একবার শুন্‌তেন, তাই বুঝে নিতেন আর তখনই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেতো। অপর কোন পোড়ো তাঁর সঙ্গে পেরে উঠ্‌তো না। লেখাপড়াতেও না, দুষ্টমিতেও না, গায়ের জোরেও না। তখন

কপাটি খেলার ভারী ধূম ছিল। ঈশ্বর কপাটি খেলাতে ধেড়ে ধেড়ে আর জোয়ান জোয়ান ছেলেদেরও জব্দ করে দিতেন। গদাধর পাল বলে এক জোয়ান ডান্‌পিটে ছোক্‌রা তাঁদের গ্রামে ছিল। গায়ে তার ভয়ানক জোর। একবার গঙ্গা পার হোতে হোতে একখানা নৌকো ডুবে যায়। গদাধর তীরে দাঁড়িয়েছিল। সে ধাঁ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজন ডুবন্ত লোককে দু'বগলে ধরে সাঁতার কেটে একখানা চলন্ত ষ্টীমারের কাছে গিয়ে হাজির হয়। ষ্টীমারের লোকেরা দড়ি ফেলে লোক দুটোকে অনায়াসে টেনে তুলে নিলে। কিন্তু গদাধরকে টেনে তুল্‌তে তাদের বেগ পেতে হোল—সে ছিল এমনি বিষম ভারী। সেই গদাধর যখন কপাটি খেলায় নাম্‌তো, ঈশ্বর তাকে পটাপট্‌ ধরে চিৎ করে ফেল্‌তেন, আর তার বুকের উপর চড়ে বস্‌তেন। ঈশ্বরের পাল্লায় পড়লে অমন যে গদাই তার অবস্থাও কাহিল হোতো। ঈশ্বরের সঙ্গে কারো পারবার যো ছিল না।

কিন্তু একটি চমৎকার জিনিষ তাঁর ভেতর দেখা যেতো। অত যে দুরন্ত, কিন্তু গুরুমশায়ের সাম্‌নে গিয়ে যেই বসা, অমনি অন্য ভাব। গুরুমশায়ের নাম ছিল কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাম্‌নে গেলেই ঈশ্বরের মনটি ভক্তিতে ভরে উঠ্‌তো। গুরুমশায়কে তিনি ঠিক দেবতার মতোই মনে করতেন।

এই সব কারণে গুরুমশায় তাঁকে আরো ভালবাসতেন। পাঠশালার ছুটির পর তাঁকে আদর করে কাছে বসিয়ে মুখে মুখে অনেক নূতন নূতন জিনিষ শেখাতেন। তার পর সন্ধ্যেবেলা নিজে কোলে করে নিয়ে ঈশ্বরকে তাঁর ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তেন। আর সকলের কাছে প্রায়ই বল্‌তেন, "ঈশ্বর খুব ভাল ছেলে। ও কালে বড়লোক হবে।" সত্যই ঈশ্বর খুব ভাল ছেলে ছিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঠশালার পড়া তাঁর সাঙ্গ হয়ে গেল। আর আর ছেলেরা পাঁচ ছ বছরে যা শিখ্‌তে পারে নি, ঈশ্বর তিন বছরের ভেতর তা ভাল করে শিখে ফেল্‌লেন। তখন কালীকান্ত গুরুমশায় ঈশ্বরের বাপকে বল্‌লেন—"আমার কাছে যা-কিছু শেখ্‌বার, ঈশ্বর তা সবই শিখে ফেলেছে। এবার ওকে কল্‌কাতায় রেখে ইংরাজী লেখাপড়া শেখান। ওর যে-রকম বুদ্ধি, তাতে ও একজন মস্ত বিদ্বান হবে।"

ঈশ্বরের বাপ কল্‌কাতায় সামান্য চাকরী করতেন, তা আগেই বলেছি। এতদিনে তাঁর মাইনে হয়েছিল মোটে ১০টি টাকা। তা হলেও ঈশ্বরের পড়ার ঝোঁক দেখে তাঁকে কল্‌কাতা নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। ঈশ্বরের বয়স তখন ৯ বছর। এই সময় ঈশ্বরের ঠাকুরদা মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তির পর ঈশ্বর তাঁর বাপের সঙ্গে কল্‌কাতা রওনা

হলেন। কালীকান্ত গুরুমশায়ও সঙ্গে চল্‌লেন। সঙ্গে একজন চাকরও চল্‌লো। অনেক দূরের পথ, প্রায় ৫২ মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হবে, তাই চাকরের ব্যবস্থা। পথে ক'দিন লাগ্‌বে কে জানে। এখন যেমন রেলে চড়ে বস্‌লেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে ৫২ মাইল পথ পৌঁছে যাওয়া যায়, তখন তো আর সে সুবিধে ছিল না। সে হোল আজ একশ' বছরেরও আগেকার কথা। আমাদের দেশে তখন রেলই হয় নি। আর কোন রকম গাড়ীও ছিল না। এক আসা যেতে পারতো নৌকোয়। কিন্তু তাতে নানা রকমের ভয় ছিল। চোর-ডাকাতের ভয়, নৌকো ডুবে যাবার ভয়, আরো কত কি ভয়। কাজেই হেঁটে না এলে আর আসার উপায় ছিল না। ঈশ্বর যে সমান ভাবে এত পথ চলে এসেছিলেন, তা নয়। সঙ্গের চাকর তাঁকে মাঝে মাঝে কাঁধে করে নিতো। তা-হলেও তিনি বেশীর ভাগ পথই হেঁটে এসেছিলেন। এ কি তাঁর কম বাহাদুরী! কিন্তু সব চেয়ে বাহাদুরীর কাজ পথে তিনি যা দেখিয়েছিলেন, তার কথা তোমাদের বলছি।

তিন দিন পথ চলার পর তাঁরা এসে বাঁধা রাস্তায় উঠ্‌লেন। নিজের গ্রাম, সঙ্গী-সাথী, মা আর ঠাকুরমাকে ছেড়ে বিদেশে যেতে ঈশ্বরের মন কেমন কর্‌ছিল নিশ্চয়।

তা হলেও নূতন জায়গা দেখে-দেখে আস্‌তে তাঁর একটুও যে ভাল লাগ্‌ছিল না, তা নয়। তাঁরা তো এসে বাঁধা রাস্তায় উঠ্‌লেন। তারপর যতই চলেন, দেখেন যে বাট্‌না-বাটা শিলের মতো এক-একখানি পাথর জায়গায়-জায়গায় পোতা রয়েছে। তা দেখে ঈশ্বরের ভারী আমোদ হোল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন?" তাঁর বাপ শুনে হেসে বল্‌লেন, "ও শিল নয়, ওকে মাইল-ষ্টোন্ বলে।" মাইল-ষ্টোন কি, ঈশ্বর বুঝ্‌তে পারলেন না। তখন তাঁর বাপ বল্‌লেন, "এটি ইংরাজি কথা। এক মাইল হোল আধ ক্রোশ, আর ষ্টোন মানে পাথর। এই রাস্তায় আধ-আধ ক্রোশ তফাতে এক-একখানি করে পাথর পোতা আছে, আর তাতে ১, ২, ৩, এই রকম অঙ্ক পর-পর খোদা আছে। এই পাথরটার অঙ্ক হোল ১৯। এই দেখে লোকে বুঝ্‌তে পারে এখান থেকে কল্‌কাতা ১৯ মাইল।" এই বলে তিনি ঈশ্বরকে পাথরের কাছে নিয়ে গিয়ে ভাল করে সেটা দেখালেন। ঈশ্বর ধারাপাতে নামতায় শিখেছিলেন "একের পিঠে নয়—উনিশ।" অমনি চট্ করে সেটা মাথায় এসে গেল। দেখামাত্রই পাথরটার ১ অঙ্কের উপর হাত দিয়ে বল্‌লেন, "বাবা, এটি তবে ইংরাজীর ১।" তারপর ৯ অঙ্কের উপর হাত রেখে বল্‌লেন,

"আর এটি ইংরাজীর ৯।" ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক বল্‌তে দেখে তাঁর বাপ ভারী খুসী হলেন, বল্‌লেন, "ঠিক বলেছ।" ঈশ্বরের তখন মহা ফুর্ত্তি। তিনি অমনি ঠিক করে ফেল্‌লেন, পথে যেতে যেতে ইংরাজী অঙ্ক চিনে ফেল্‌তে হবে। মুখে আর তখন কিছু বল্‌লেন না। তার পর ১৯ থেকে ১০ পর্য্যন্ত এসে বল্‌লেন, "বাবা, আমার ইংরাজী অঙ্ক চেনা হোল। আমি ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত শিখে ফেলেচি।" সত্যি কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে পথ চল্‌তে চল্‌তে ঈশ্বরকে ৯, ৮, ৭, এই তিনটি মাইল-ষ্টোন পর পর দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হোল, সেগুলি কোন্ কোন্ অঙ্ক। ঈশ্বর ঠিক ঠিক বল্‌লেন। তাঁর বাবার তবু সন্দেহ গেল না। তিনি ভাব্‌লেন, নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত হবেই, অঙ্ক চিন্‌তে না শিখ্‌লেও এটা চালাকি করে বলা যায়। তিনি এক মতলব করলেন। ৬ নম্বরের মাইল-ষ্টোনটার কাছ-বরাবর যখন এলেন, তখন ঈশ্বরকে গল্পে ভুলিয়ে রেখে সেটা দেখ্‌তে দিলেন না। তারপর ৫ নম্বরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল তো ঈশ্বর, এটা কত অঙ্ক? তোমার হিসেব-মতো কত হয়?" ঈশ্বর বল্‌লেন, "বাবা, এটা হবে ছয়ের অঙ্ক, কিন্তু ভুলে ৫ লিখেছে।" তখন তাঁর বাবা ভারী খুসী হয়ে বল্‌লেন, "ঠিক বলেছ তুমি। এটা পাঁচের অঙ্কই বটে। তোমায় পরীক্ষা করবার জন্যে

ছয়ের অঙ্কটা তোমায় দেখ্‌তে দিই নি।” কালীকান্ত গুরুমশায়ের তো মহা আহ্লাদ! ঈশ্বরের চিবুক ধরে “বেশ বাবা বেশ” বলে কত যে আদর করলেন, কত যে আশীর্ব্বাদ করলেন তার আর সীমা নেই। এঁদের আহ্লাদ দেখে ঈশ্বরেরও ভারী আহ্লাদ হোল।

ঈশ্বরের এই বাহাদুরীতে তোমাদেরও খুব আনন্দ হচ্ছে, নিশ্চয়।

ঈশ্বরচন্দ্র "বিদ্যাসাগর" হলেন

ঈশ্বর তো তাঁর বাপের সঙ্গে কল্‌কাতায় এলেন। তখনকার কল্‌কাতা আর এক ধরণের ছিল। এখন যেমন কল্‌কাতায় প্রথম এলে সহরে ঢুকেই তাক্ লেগে যায়, তখনকার দিনে সে-রকম তাক্ লাগ্‌তো না। এখনকার কল্‌কাতায় আর তখনকার কল্‌কাতায় অনেক তফাৎ। তখন রাস্তায় রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বল্‌তো না, ট্রাম চল্‌তো না, মোটর ছুট্‌তো না। তখন জলের কল ছিল না, এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল না। এত গাড়ী-ঘোড়া, এত হট্টগোল ছিল না। তখন যা ছিল, তা তোমরা এখনকার কল্‌কাতা দেখে ধারণাই করতে পার না। তখন সন্ধ্যা হলেই পাড়াগাঁয়ের মতো চার্‌দিক অন্ধকারে ভরে যেতো। এখন সন্ধ্যার পর চৌরঙ্গীর দিকে বেড়াতে গেলে ইন্দ্রপুরী বলে মনে হয়, তখন এ-সব জায়গা বন-জঙ্গলে ভরা ছিল; ভয়ে কেউ সেদিকে ঘেঁস্‌তো না। সহরের ভেতরটা নালা-নর্দ্দমা, পুকুর আর খানা-ডোবায় ভর্ত্তি ছিল; আর তাতে পচা ময়লা জল ভট্‌ভট্ করতো।

চারদিকেই বন-জঙ্গল। ঠিক যেন একটা পাড়াগাঁ। সত্যি তখনকার কল্‌কাতা একটা বড় পাড়াগাঁয়ের মতোই ছিল। কল্‌কাতায় এসে ঈশ্বরের মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। যাঁদের বাড়ীতে এসে রইলেন, তাঁরা ঈশ্বরকে ছেলের মত আদর-যত্ন করলেও, মায়ের জন্যে আর ঠাকুমার জন্যে তাঁর বড্ড মন কেমন করতো। তখন কল্‌কাতায় এলেই অসুখে পড়তে হোত। ঈশ্বর নূতন এসেছেন, এখানের জল-হাওয়া তাঁর সহ্য হোল না। তিনি অসুখে পড়লেন—ভয়ানক পেটের অসুখ, কিছুতেই আর সারে না। অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশে তাঁর মা আর ঠাকুমা কেঁদে-কেটে অস্থির হলেন। শেষটায় তাঁর ঠাকুমা কল্‌কাতায় এসে হাজির হলেন এবং ঈশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ী গেলেন। বাড়ীতে গিয়ে তাঁর অসুখ সেরে গেল। পাঁচ-ছ মাস পরে আবার তিনি কল্‌কাতায় এলেন।

এবার তাঁকে ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে হবে। তখনকার-দিনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা আর এক ধরণের ছিল। কল্‌কাতায় তখন এত ইস্কুল-কলেজ ছিল না। হেয়ার সাহেবের ইস্কুল, হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজ, এই ক'জায়গায় তখন ভাল পড়ানা হোত। হেয়ার ইস্কুলে আর হিন্দু কলেজে ভাল ইংরাজী শেখানো হোত, আর সংস্কৃত

কলেজে কেবল সংস্কৃত পড়ানো হোত। এদেশে তখনো ইংরাজীর এত বেশী চলন হয় নি। হিন্দু কলেজ সবে তখন দশ বার বছর মাত্র হয়েছে। অন্য সব জায়গায় তখনো ইংরাজী শেখাবার যা দুর্দ্দশা, তা শুনলে তোমরা না হেসে থাকতে পারবে না। কতকগুলো ইংরাজী কথা নামতার মতো সুর করে ছেলেদের মুখস্থ করতে হোত। যেমন—

পম্‌কিন্‌—লাউ কুম্‌ড়ো, কোকোম্বর—শশা।
ব্রিঞ্জেল্‌—বার্ত্তাকু, প্লোমেন্‌—চাষা॥

শুধু তাই নয়। কখন কখন আবার ইংরাজী কথা আর তার মানে, গানের মতো সুর করে গাওয়া হোত। যেমন—

নাই (Nigh) কাছে, নিয়ার (Near) কাছে,
নিয়ারেষ্ট (Nearest) অতি কাছে।
কট্‌ (Cut) কাট্‌, কট্‌ (Cot) খাট্‌,
ফলোয়িং (Following) পাছে॥

এক একটি ইংরাজী কথার যে ক'রকমের মানে হয়, তা এক জায়গায় করে সাধ্‌তে হোত। যেমন—

Well—আচ্ছা, ভাল, পাত্‌কো।
Bear—সহ, বহ, ভল্লুক।

তখনকার দিনে শুধু যে যত বেশী ইংরাজী কথা আর তার মানে বল্‌তে পারতো, তাকে তত বড় বিদ্বান বলে

ধরা হোত। সে জন্যে অনেকে এসকল ছোটখাট ব্যাপারের ভেতর না গিয়ে একেবারে ডিক্‌সনারিকে-ডিক্‌সনারি মুখস্থ করে ফেল্‌তো।

ঈশ্বর যখন কল্‌কাতায় পড়তে এলেন, তখন এই সব সেকেলে ধরণের পড়া প্রায় উঠে গেছে। হিন্দু কলেজে তখন ভাল করে ইংরাজী পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাপ ঈশ্বরকে ইংরাজী পড়াতে চাইলেন না। তখন সংস্কৃত কলেজে খুব উচুঁ ধরণের সংস্কৃত পড়া হোত। এখানে ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছাড়া অন্য ছাত্র তখন পড়তে পেতো না। তখন চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না। ছেলেরা সকলেই ফরাসের উপর বসে টোলের ধরণে পড়তেন। পণ্ডিতেরা আলাদা আসনে তাকিয়া ঠেসান্ দিয়ে বসে পড়াতেন। ঈশ্বরের বাপ সেকেলে বামুন-পণ্ডিত কিনা। তাই তিনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্ত্তি করে দিলেন। ছেলে সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হবেন, আর দেশে গিয়ে টোল খুলে বসে বংশের নাম রাখ্‌বেন, এই ছিল তাঁর মনের সাধ।

দেশের পাঠশালায় ঈশ্বর যেমন সকলকার চাইতে ভাল ছেলে ছিলেন, এখানেও তাই হলেন। পড়ায় তাঁকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। তু একবার পড়লেই তাঁর পড়া তৈরী হয়ে যেতো। একবার বলে দিলেই তিনি বিষয়টি বুঝে

নিতেন, আর মুখস্থও হোত তেমনি চট্‌পট্‌। এইজন্যে প্রথম দিন হোতেই তিনি কলেজের পণ্ডিত মশায়ের ভালবাসার পাত্র হলেন।

ঈশ্বরের বাপও ঈশ্বরের লেখাপড়ার দিকে খুব কড়া নজর রাখ্‌লেন। ঈশ্বর কলেজে যা পড়ে আস্‌তেন, বাসায় এসে বাপের কাছে তা তাঁকে ঠিক ঠিক বল্‌তে হোত। ঈশ্বরকে তিনি সর্ব্বদা চোখে-চোখে রাখ্‌তেন। সকাল বেলা তাঁকে সঙ্গে করে কলেজে রেখে আস্‌তেন, আবার বিকেল বেলা সঙ্গে করে বাসায় আন্‌তেন। এই রকম পাঁচ ছ মাস করেছিলেন। এতে তিনি অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশ্‌তে পেতেন না। ছেলেরা কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে বড্ডই লাগ্‌তে আরম্ভ করলো। ঈশ্বরের চেহারাটি ছিল বামনের মতো বেঁটে একরত্তি, কিন্তু মাথাটা ছিল মস্ত বড়। সে জন্যে তাঁকে ছেলেবেলায় এক অদ্ভুত রকম দেখাতো। ছাতা মাথায় দিয়ে চল্‌লে তিনি ছাতায় এমনি ঢাকা পড়ে যেতেন যে, তাঁকে দেখাই যেতো না, মনে হোত যেন ছাতাটাই চলে যাচ্ছে। তাঁর মাথাটা বড় ছিল, তাই দেখে ছেলেরা তাঁকে 'যশুরে কৈ' বলে ক্ষেপাতো, আর তিনি অমনি চটে লাল হয়ে উঠ্‌তেন। তার উপর আবার তিনি ভয়ানক তোত্‌লা ছিলেন। চটে গেলে আরো মুস্কিল হোত, কথা মুখ দিয়ে

বেরুতোই না, কেবল বেরুতো তো-তো-তো শব্দ। ছেলেরা তাতে আরো মজা পেয়ে তাঁকে ক্ষেপাতো। কিন্তু তাতে কি যায়-আসে। ছ মাস পরে যখন পরীক্ষা হোল, দেখা গেল যে, যাকে তারা 'যশুরে কৈ' বলে ঠাট্টা করে এসেছে, সেই ছেলেটা তাদের চাইতে ঢের বেশী নম্বর পেয়ে সকলের উপরে উঠে গেছে। তার ওপর আবার পাঁচ টাকার জলপানি। এই রকম ফল পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পড়ার জিদ্ আরো বেড়ে গেল। তার পর বছর-বছর প্রথম হয়ে তিন বছরের ভেতর তিনি ব্যাকরণর পড়া শেষ করলেন আর এমন সংস্কৃত শিখ্লেন যে, সংস্কৃতে কথা কইতে তাঁর মুখ দিয়ে যেন খই ফুট্তো।

ব্যাকরণের পর সাহিত্যের পড়া। তিনি সাহিত্যের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মোটে ১১ বছর। বড্ড ছেলে মানুষ দেখে সাহিত্যের পণ্ডিত মশাই তাঁকে ভর্ত্তি করতেই চাইলেন না। বল্লেন "অতটুকু ছেলে সাহিত্যের কি বুঝ্বে ?" কিন্তু ঈশ্বর তো আর যে-সে ছেলে নন্! তিনি পণ্ডিত মশাইকে বল্লেন, "বুঝ্তে পারবো কি না পারবো, আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। যদি না পারি, ভর্ত্তি করবেন না।" পণ্ডিত মশাই আর তখন কি করেন! পরীক্ষা করতে হোল। পরীক্ষা করে তিনি অবাক্। ঈশ্বর এমন সব বিষয় জানেন, যা অনেক বড় বড় ছেলে, যারা

সাহিত্যের শ্রেণীতে এক বছর দু বছর ধরে পড়্ছে, তারাও তা জানে না। তখন তাঁকে ভর্ত্তি করে তো নিলেনই, সেই থেকে তাঁকে এমন ভালবাস্তে লাগ্লেন যে একেবারে নিজের ছেলের মতো।

সাহিত্যের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে ঈশ্বর আগের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশী মনোযোগী হলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ভারী একগুঁয়ে। দেশের পাঠশালায় যখন পড়তেন তখন নানা রকমের দুষ্টুমির ভেতর দিয়ে একগুঁয়েমি দেখা যেতো। কল্কাতায় এসে দুষ্টুমি কমে গেল বটে, কিন্তু একগুঁয়েমি বেড়েই চল্লো। একগুঁয়েমির ঝোঁক্টা সব গিয়ে পড়লো লেখাপড়ার উপর। তিনি প্রায় সমস্ত রাত জেগেই লেখাপড়া করতে সুরু করলেন। সন্ধ্যে থেকে দশটা পর্য্যন্ত পড়তেন। দশটার পর শুতে যেতেন। শুতে যাবার সময় বাবাকে বলে যেতেন দুঘণ্টা পরে জাগিয়ে দিতে। ঘড়িতে বারোটা বাজ্লেই তাঁর বাবা তাঁকে জাগিয়ে দিতেন—আর তিনি সমস্ত রাত জেগে পড়া করতেন। এই রকম কঠিন পরিশ্রমে তাঁর মাঝে মাঝে ভয়ানক ব্যারাম হোত। কিন্তু সে সকল তিনি গ্রাহ্যই করতেন না।

এই রকম শুধু লেখাপড়ার কাজ নিয়ে থাক্তে পেলেও বা কথা ছিল, তাঁকে বাড়ীর কাজের জন্যেও খাট্তে হোত

খুব বেশী। বাসায় তাঁর বাপ আর মেজ ভাই থাকতেন। ঝি-চাকর বা রাঁধুনি ছিল না। কারণ আগেই বলেছি ঈশ্বরের বাপ ছিলেন ভারী গরীব। দুবেলা রান্নার কাজ ঈশ্বরকেই করতে হোত। শুধু কি রান্নার কাজ! ভোরবেলায় উঠে একটুখানি বই নিয়ে বসেই স্নান করতে যেতেন। স্নান করে ফেরবার সময় বাজার থেকে আলু-পটোল-তরকারী কিনে আনতেন। নিজেই বাট্‌না বেটে নিতেন, উনুন ধরাবার জন্যে কাঠ চেলা করতেন। উনুন ধরিয়ে রান্না করতেন। চার পাঁচ জন লোক বাসায় খেতেন। তিনি তাঁদের সকলকে আগে খাইয়ে নিজে সকলের শেষে খেতেন, তারপর এঁটো পরিষ্কার করে, বাসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে তবে পড়তে বসবার সময় পেতেন। রান্না করতে করতে বা ইস্কুল যাবার সময় পথ চল্‌তে চল্‌তে তিনি পড়া করতেন। বাট্‌না বেটে আর বাসন মেজে তাঁর নখগুলো অনেকটা করে খয়ে গেছ্‌লো। তোমরা এসব শুনে হয়তো শিউরে উঠ্‌ছ। কিন্তু আরো বেশী শিউরে উঠ্‌বে যদি ঈশ্বরের খাওয়া-দাওয়ার কথা শোন।

এদিকে তো এই রকম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, ওদিকে কিন্তু সব দিন তিনি ভাল করে খেতেই পেতেন না। কি কষ্টে যে তাঁর দিন কাট্‌তো তা আর কি বল্‌বো। কোন দিন তাঁর অন্ন জুট্‌তো, কোন দিন জুট্‌তো না। যদি জুট্‌তো, তাও পেট ভরে

নয়। যে দিন পেঠ ভরে দুটো ভাত জুট্‌তো, সে দিন আবার তরকারী জুট্‌তো না—কেবল নুন মেখে ভাতগুলি খেতে হোত। মাছ তরকারী কোন দিন জুট্‌লে, একবেলা খালি ঝোলটুকু, একবেলা বা শুধু তরকারীগুলি, একবেলা বা মাছটুকু এই রকম হিসেব করে দু'দিন আড়াই দিন চালাতে হোত।

কিন্তু এত যে কষ্ট, এত যে অভাব, ঈশ্বরের কি তাতে পড়ার জিদ্‌ এতটুকুও কমেছিল? মোটেই না। তিনি বরাবর যেমন সকলকার উপরে হয়ে এসেচেন, সাহিত্যের শ্রেণীতেও তাই হলেন। যতবার পরীক্ষা হয়, তিনিই বেশী নম্বর পান। তাঁর কাছে পুরাণো নামকরা ছেলেরাও ঘেঁষ্‌তে পারে না। চারবছরের ভেতর তাঁর সাহিত্যের পড়া শেষ হোল, আর তিনি অনেকগুলি পুরস্কার পেলেন। এই ক'বছরে তাঁকে কি রকম শক্ত শক্ত সংস্কৃত বই পড়তে হয়েছিল, তার নাম বল্‌ছি শোন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মাঘ, ভারবি, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী এই ধরণের আরো কত বই। বড় হলে তোমাদেরও এর অনেক বই পড়তে হবে, তখন দেখো, সে-সব কত শক্ত। এই সকল বই তাঁর আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। শেষ পরীক্ষায় খুব বেশী নম্বর রেখে তিনি সকলের উপরে হলেন—সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো।

ব্যাকরণ হোল, সাহিত্য হোল এবার অলঙ্কার। যত উপরে উঠ্ছেন পড়াও তত কঠিন হচ্ছে। কিন্তু তাঁর কাছে কঠিন বলে, অসম্ভব বলে কিছু ছিল না—সব যেন জলের মতো। এক বছরের ভেতরেই তাঁর অলঙ্কারের পড়াও শেষ হয়ে গেলো। এবারেও তিনি সকলের উপর হলেন আর অনেক টাকা আর ভাল ভাল বই পুরস্কার পেলেন।

ঈশ্বরের এখন খুব নাম-যশ। সকলের মুখেই তাঁর সুখ্যাতি। শুধু যে তিনি লেখাপড়াতেই পণ্ডিত হচ্ছেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁর অনেক সদ্‌গুণও ফুটে উঠ্ছে। তিনি প্রাণপণ যত্নে বাপ-মায়ের সেবা করতেন, দেবতার চেয়েও তাঁদের বড় বলে মান্‌তেন, ভাইগুলিকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাস্‌তেন। আগে তাদের খাইয়ে শেষে নিজে খেতেন। একটু কিছু হোলে ভেবে আকুল হতেন। তাদের কষ্ট দেখ্‌লে অত্যন্ত কাতর হতেন। এই অল্প বয়সেই ঈশ্বরের শরীরেও যে কি রকম দয়া মায়া ছিল, তা আর কি বল্‌ব। নিজের এ দিকে এত অভাব, কিন্তু যদি দেখ্‌তেন যে, কোন লোক কষ্টে পড়েছে, তা হোলে যেমন করে হোক্ তার উপকার করতেন। যে ছেলের বই নেই, নিজের বৃত্তির ক'টি টাকা থেকে তাকে বই কিনে দিতেন, যার কাপড় নেই, তাকে কাপড় কিনে দিতেন। নিজে কিন্তু চরকা-কাটা সূতোর তৈরি

গুণচটের মতো মোটা আর খাটো কাপড় পরে ইস্কুলে যেতেন। এই কাপড় তাঁর মা তাঁর জন্যে নিজের হাতে তৈরী করে পাঠিয়ে দিতেন। হাতে পয়সা থাক্‌লে ইস্কুলে যদি কোন কোন দিন জলখাবার খেতেন, সে সময় সাম্‌নে যারা থাক্‌তো তাদেরও যত্ন করে খাওয়াতেন। কোন ছেলের অসুখ করলে প্রাণপণে তার সেবা করতেন। এই বয়সে তাঁর মনটি এ রকম বড় ছিল।

নিজের গ্রামে যখন তিনি যেতেন, তখন তাঁর সব-প্রথম কাজ ছিল কালীকান্ত গুরুমশায়ের বাড়ী গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নেওয়া। ছোটবেলার পাঠশালার গুরুমশায়কে তিনি আগের মতোই ভক্তি করতেন। আর গ্রামের লোকের উপরেই বা তাঁর কি টান ছিল! কারো অসুখ করেছে, তিনি গিয়ে তার সেবা করছেন। কেউ খেতে পাচ্ছে না তিনি তাকে খাবার দিচ্ছেন। কেউ কষ্টে পড়েছে তিনি সাধ্যমত তার উপকার করছেন। অপরের দুঃখ-কষ্টকে তিনি নিজেরই দুঃখ-কষ্ট বলে মনে করতেন, তাঁর প্রাণটি এমনই কোমল! এই সব কারণে গ্রামের লোক বালক ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে ডাকৃতো। তিনি বিদ্যার সাগর হয়েছিলেন পরে, কিন্তু দয়ার সাগর হয়েছিলেন অনেক আগে থেকেই। কুকুর বেরালটি মরলেও তাঁর চোখে জল পড়তো। এখন

তোমরা বুঝ্‌তে পারছ কি, ঈশ্বরচন্দ্রের কি অসাধারণ গুণ ছিল ?

ঈশ্বরের সংস্কৃতের পড়া শেষ হতে এখনো অনেক বাকী। এবার তিনি স্মৃতির শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলেন, আর আগের চেয়ে অনেক বেশী মেহনত করতে লাগ্‌লেন। স্মৃতি খুব কঠিন শাস্ত্র। এত কঠিন যে, দু তিন বছর ধরে পড়েও ভাল ভাল ছেলেরা এর পরীক্ষায় সুবিধে করে উঠ্‌তে পারে না। ঈশ্বর কিন্তু ছমাসের ভেতরেই স্মৃতির পড়া শেষ করে "জজ পণ্ডিত" হবার জন্যে পরীক্ষা দিলেন। "জজ পণ্ডিত" তখনকার দিনে হাকিমের মতোই সম্মানের পদ। অনেক বয়সে গিয়ে অনেক মেহনত করে তবে লোকে এ পরীক্ষা দিতে পারতো। ঈশ্বরের কিন্তু সবই অদ্ভুত। যেই পরীক্ষা দেওয়া অমনি পাশ করা। তা আবার যেমন তেমন করে পাশ করা নয়, সকলের চেয়ে বেশী নম্বর রেখে, সকলের উপর হয়ে। আর তখন তাঁর বয়সই বা কত ? বড় জোর সতের। এত অল্প বয়সেই তিনি "জজ পণ্ডিত" হলেন। তখন তাঁর বাপের কি আনন্দ! যে শুনলো, সেই ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো। কত বড় বড় লোক যে ঈশ্বরকে দেখ্‌তে এলেন তার ঠিক নেই।

এই সময় ত্রিপুরার "জজ পণ্ডিতের" পদ খালি হোল, আর ঈশ্বর চট্‌ করে সেই পদ পেয়ে গেলেন। কিন্তু

তিনি তখন ছেলে মানুষ, সেজন্যে তাঁর বাপ তাঁকে একা দূরদেশে পাঠাতে রাজী হলেন না। বাপের অমত হওয়ায় এ কাজ তাঁর নেওয়া হোল না। আবার তিনি পড়ায় মন দিলেন। দু' বছরের ভেতর অন্য সব পরীক্ষা শেষ করে, উনিশ বছর বয়সে বেদান্ত পড়তে সরু কর্‌লেন। এর ভেতর আবার তিনি ইংরাজীও শিখেছিলেন। সংস্কৃতে তো মহা বিদ্বান হয়ে উঠেছিলেন। বড় বড় মজ্‌লিসে বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেন, শাস্ত্রের বিচার করতেন। সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত কবিতা, ভাল ভাল সংস্কৃত শ্লোক তৈরী করতে পারতেন। বড় বড় সভায় নিজের লেখা সংস্কৃত কবিতা সুন্দর করে পড়ে শোনাতেন; তা শুনে বুড়ো বুড়ো দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরাও বাহবা না দিয়ে থাক্‌তে পারতেন না।

বেদান্তের পরীক্ষা দিয়ে তিনি ন্যায় আর দর্শনের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলেন। বেশ মন দিয়ে পড়ে এক বছরের ভেতরেই পড়া শেষ করে ফেল্‌লেন, আর পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পেলেন। একটা রচনার পরীক্ষাও এই সময় হোল, তাতেও তাঁর লেখাটি সবার চাইতে ভাল হওয়ায়, তিনি আরও ১০০৲ টাকা পুরস্কার পেলেন। এই বার তাঁর সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেল। সংস্কৃতের আর কোন পড়াই তাঁর বাকী রইলো



ঈশ্বরচন্দ্র—তরুণ বয়সে

না। যে সকল পণ্ডিত তাঁকে পড়িয়েছিলেন, তাঁরা খুসীও যেমন হলেন, তেমনি আশ্চর্য্যও হলেন। ঈশ্বর সকল পরীক্ষাতেই ভাল করে পাশ করেছেন, সকলের উপরে হয়েছেন, আর বরাবর পুরস্কার আর বৃত্তি পেয়ে এসেছেন। অন্য ছেলেদের বেলা যেমন হয়ে এসেছে, ঈশ্বরকে তেমনি শুধু একখানি 'সার্টিফিকেট্' দিলেই তো হবে না, এমন কিছু তাঁকে দিতে হবে, যা আর কাউকে দেওয়া হয় নি। তখন পণ্ডিতেরা সকলে মিলে পরামর্শ করে ঈশ্বরকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিলেন। ২১ বছরের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র সেই থেকে হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশে বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর বাপ-মার আর তাঁর ঠাকুমার তখন কত আনন্দ বল দেখি?

দেশের কাজ ও দশের সেবা

ঈশ্বরচন্দ্র এবার 'বিদ্যাসাগর' হয়েছেন, আমরাও এখন থেকে তাঁকে "বিদ্যাসাগর" বল্‌ব।

বিদ্যাসাগরের লেখাপড়া সাঙ্গ হয়েছে, এবার তাঁকে রোজগার করতে হবে। কারণ, তাঁর বাপ গরীব, আর এর ভেতর তাঁর বিয়েও হয়ে গেছলো। যখন তিনি সাহিত্যের পড়া শেষ করেন, তখন তাঁর বাপ বিয়ে দিয়ে দেন। তিনি বাপের কথা কখন অমান্য করতেন না; কাজেই ইচ্ছা না থাক্‌লেও অল্প বয়সে তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল।

চাকরি পাবার জন্যে কিন্তু তাঁকে কারো খোসামোদ করতে হয় নি। তখন "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" বলে সাহেবদের এক কলেজ ছিল। লালদীঘির ধারে এখন "রাইটার্স বিল্ডিংস্" বলে যে প্রকাণ্ড বাড়ী, এ বাড়ী তখনো ছিল, আর এই বাড়ীতেই সেই কলেজ ছিল। যে সকল সাহেব এদেশে এসে হাকিম হবার জন্যে শিক্ষা পেতেন, তাঁদের তখন বাংলাও শিখ্‌তে হোত। বিদ্যাসাগর মশাই সাহেবদের বাংলা পড়াবার জন্যে এই কলেজের সব চেয়ে বড় পণ্ডিতের পদ



The Indian Press, Ltd ,
Benares-Branch.

বিদ্যাসাগর-পত্নী

পেলেন। মাইনে হোল ৫০৲ টাকা। ৫০৲ টাকা মাইনে আজকালের দিনে বেশী নয় বটে, কিন্তু তখনকার দিনে এই মাইনের চাকরিকে বড় চাকরি বলে ধরা হোত। নিজে তিনি রোজগার করতে লাগ্‌লেন, তখন আর বুড়ো বাপকে মেহনত করতে না দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

সংস্কৃত পড়বার সময়েই তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখেছিলেন। এখন বেশ ভাল করে ইংরেজী আর সেই সঙ্গে হিন্দীও শিখে নিলেন। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি আর কাজ করবার ক্ষমতা দেখে উপরওয়ালারা খুবই খুসী। বড় বড় সাহেব, যাঁরা তাঁর চাইতে অনেক বেশী টাকা মাইনে পান, তাঁরাও তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কাজ করেন না, সকলে তাঁকে এমনি খাতির করতে লাগ্‌লেন।

পাঁচ বছর সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে তিনি সংস্কৃত কলেজে এলেন 'এ্যাসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারি' অর্থাৎ সহকারী সম্পাদক হয়ে। সম্পাদক হলেন বড়, তার নীচেই সহকারী সম্পাদক; কাজেই এটিও একটি সম্মানের পদ। তোমাদের মনে আছে বোধ হয় যে, এই কলেজে পড়েই তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পেয়েছিলেন। এখানে চাকরি পেয়ে তিনি কলেজের অনেক রকম উন্নতি করবেন মনে করলেন। কিন্তু যে ধরণে কাজ করবেন ভেবেছিলেন, তা হোল না। নানা

রকম বাধা হোতে লাগ্‌লো। তিনি ছিলেন ভারী তেজী লোক। কারো খোসামোদ করা তাঁর স্বভাব নয়। উচিত কথা বল্‌তে তিনি ভয় পেতেন না। কারো কাছে মাথা নীচু করতেন না, অন্যায় দেখ্‌তে পারতেন না। এই ধরণের যাঁর স্বভাব, তাঁর চাকরি করা অনেক সময় মুস্কিল হয়। তাঁরও তাই হোল। এখানে তাঁর বেশী দিন কাজ করা পোষাল না। উপরওয়ালারা তাঁর কাজে নানারকম বাধা দিতে লাগ্‌লেন। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিলেন। অনেকে বারণ করলেন, কিন্তু কারো কথা তিনি শুন্‌লেন না।

চাকরি ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু চাকরিই ছিল তখন তাঁর একমাত্র উপায়। কাজেই তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাগ করে তো চাকরি ছাড়লে, এখন খরচ চল্‌বে কি করে?" তিনি বল্‌লেন "আলু পটোল বেচ্‌বো, না হয় মুদীর দোকান করে দিন চালাব, তবু যে চাকরিতে সম্মান নেই, সে চাকরি করবো না।" এমনি ছিল তাঁর মনের বল। অথচ অনেকগুলি লোকের খাওয়া-পরার ভার তখন তাঁর উপর। প্রায় কুড়িটি গরীব ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে পড়াশুনো করছিল। তিনি কারো খাওয়া-পরা বন্ধ করলেন না বা দমে গেলেন না; ধার করে খরচ চালাতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু তাঁর মত লোককে কি বেশী দিন অমনি বসে থাক্‌তে হয়! ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে আগের চেয়ে বেশী মাইনেতে আবার তিনি চাকরি পেলেন। এখানে কিন্তু তিনি বেশী দিন থাক্‌তে পেলেন না। এখন তাঁর সুনাম বেরিয়ে পড়েছে। সংস্কৃত কলেজের কাজ তিনি বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারাই আবার তাঁকে চায়। এবার আরও বেশী মাইনে দিয়ে সাহিত্যের পণ্ডিত করে তাঁকে এখানে আনা হোল। আগে যে সব কাজ করবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন এবার তিনি তার সুযোগ পেলেন। তাঁর কাজ দেখে উপরওয়ালারা ভারী খুসী হলেন, আর অল্প দিনের ভেতরেই তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন। বিদ্যাসাগর মশাই হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল। এখন তাঁর মাইনে হোল ১৫০৲ টাকা।

কলেজের কর্ত্তা হয়ে বসে কলেজের নিয়মকানুন তিনি যেমন ভাল করে বেঁধে দিলেন, তাঁর আগে আর কেউ তেমন পারেন নি। কিছুদিন পরে ১৫০৲ টাকা থেকে তাঁর মাইনে হোল ৩০০৲ টাকা। আর একটা বড় পদ তিনি এই সঙ্গে পেলেন। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া আর মেদিনীপুর এই চার জেলায় গ্রামে গ্রামে ইস্কুল বসাবার জন্যে আর সে সকল দেখে বেড়াবার জন্যে তিনি ইন্স্‌পেক্টার

নিযুক্ত হলেন। ইন্‌স্‌পেক্টার কি, তা তোমরা বুঝ্‌তেই পারছো। তোমাদের ইস্কুলে মাঝে মাঝে ইন্‌স্‌পেক্টার আসেন। তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অনেক সময় তোমাদের পরীক্ষাও দিতে হয়। বিদ্যাসাগর মশায় সেই রকমের ইন্‌স্‌পেক্টার হলেন। এখন অনেক ইন্‌স্‌পেক্টার হয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় ছিলেন তখনকার দিনে সকলের বড় ইন্‌স্‌পেক্টার। পাল্কী চড়ে তিনি ইস্কুল তদারক করে বেড়াতেন। এ কাজের জন্যে তিনি আলাদা ২০০৲ টাকা করে মাইনে পেতে লাগ্‌লেন। তাঁর মাইনে তাহলে দুয়ে জড়িয়ে হোল ৫০০৲ টাকা। তখনকার দিনে ৫০০৲ টাকা, বড় সামান্য কথা নয়। আর ৫০০৲ টাকা মাইনে যাঁর, তিনিও বড় যে সে লোক নন।

তিনি এখন মস্ত বড় লোক। দেশের বড় বড় জমিদার, রাজারাজড়া, ধনী, বিদ্বান, সকলেরই সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোল। এমন কি, বড় বড় সাহেবরা পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্‌তে লাগ্‌লেন। দেশে কি করে লেখাপড়ার চর্চ্চা বাড়বে, কি উপায়ে ভাল ভাল ইস্কুল কলেজ হবে, এই জন্যেই তিনি দিনরাত মেহনত করতেন। ধনী হোক্ বা গরীব হোক্, কি করে সকলে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হবে, সেই চেষ্টাই তিনি করে বেড়াতেন, এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত যাতে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে, তা নিয়েও তিনি দিন-রাত

ভাব্‌তেন, আর সে জন্যে প্রাণপণ যত্ন করতেন। দেশের অনেক ধনী লোক তাঁর এই সব কাজের সহায় হলেন, অনেক বড় বড় সাহেবও তাঁর পক্ষে হলেন। তখন এদেশে ছেলেদের জন্যে ভাল ইস্কুল ছিল না। বিদ্যাসাগর মশায় এজন্য উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। শেষে এই ঠিক হোল যে, জেলায় জেলায় ভাল ভাল ইস্কুল খোলা হবে। বিদ্যাসাগর মশায়ের উপরেই এ কাজের ভার পড়লো। তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর এই চার জেলায় ঘুরে ঘুরে যে কত ইস্কুল বসালেন তা গুণে শেষ করা যায় না। ছেলেরা সব ইস্কুলে যাবে, লেখা পড়া শিখ্‌বে আর মেয়েরা কি মুখ্যু হয়ে থাক্‌বে? মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে, সেদিকে তাঁর গোড়া থেকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্যেও অনেকগুলি ইস্কুল খুল্‌লেন। এখন যেমন আমাদের বাড়ীর মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌ছেন—অনেকে বিদ্বানও হচ্ছেন, তখনকার দিনে বিদ্বান হওয়া দূরের কথা, ক, খ, শেখ্‌বারও উপায় ছিল না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে লোকে বরং নিন্দাই করতো। এদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্যে বিদ্যাসাগর মশায়ের মতো আর একজন লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তিনি একজন ইংরাজ—তাঁর নাম বেথুন সাহেব। ইনি বিদ্যাসাগর মশায়ের

একজন বন্ধু। হেদোর ধারে বেথুন কলেজ বলে মেয়েদের পড়বার জন্যে যে কলেজটি আছে, এই বেথুন সাহেব এটি প্রতিষ্ঠা করে যান। বেথুন সাহেব মারা গেলে পর এই কলেজের সমস্ত ভার বিদ্যাসাগর মশায়ের উপর পড়ে। ইনি এর জন্যে যে কত খেটেছেন তার সীমা নেই। তিনি ছিলেন সাহসী, সৎ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই সম্মান পেতেন। বড় লাট সাহেব আর ছোট লাট সাহেব তাঁকে রাজা-রাজড়ার চেয়েও খাতির করতেন, ধনী লোকদের ফেলে আগে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। তোমরা হয়ত ভাব্‌ছ যে, বিদ্যাসাগর মশায় না জানি কি রকম জাঁকজমক করেই এঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কিন্তু জাঁকজমক তাঁর মোটেই ছিল না। এত যে বড় হয়েছেন, এত যে তাঁর পয়সা হয়েছে, কিন্তু সাজ পোষাক তাঁর কি রকম ছিল শুন্‌বে? জামা, কামিজ তিনি মোটেই গায়ে দিতেন না। গায়ে একখানি পরিষ্কার ধপ্ ধপে চাদর জড়াতেন, আর পায়ে দিতেন তালতলার চটী। ফিতে বাঁধা বুট্‌জুতো বা লেস্ দেওয়া শ্লিপার এ সব কখনো তাঁর পায়ে উঠে নি। গাড়ী ঘোড়াও তিনি চড়তেন না; তবে হাঁট্‌তে না পারলে পাল্কী করে যেতেন। তাঁর চেহারাটি— যে রকম ছবিতে বা পাথরের মূর্ত্তিতে তোমরা দেখ্‌তে পাও,

অবিকল সেই রকম ছিল দেখ্‌তে। মাথার চারটি ধার একেবারে নেড়া—ঠিক উড়ের মতো। কিন্তু এই চেহারা আর এই পোষাকের কাছে মাথা নীচু কর্‌তো না তখনকার দিনে এমন কোন লোক ছিল না, বা এখনকার দিনেও কেউ নেই। অনেক বড় বড় লোক সাধাসাধি করতেন তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে। একবারের একটা ঘটনা বলি। কোন এক তর্কবিতর্কের গোলমাল মিটিয়ে দেবার জন্যে ছোটলাট সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সে সময় তাঁর বাবা মারা গেছ্‌লেন। তিনি লাটসাহেবকে জানালেন "আমার বাবা মারা গেছেন, আমি এক কাপড়ে অপরিষ্কার ভাবে আছি, এখন আপনার কাছে যাবার জন্যে পরিষ্কার কাপড় চোপড় আমার পরবার যো নেই। তবে যদি আপনার অপমান বোধ না হয়, আমি খালি গায়ে ময়লা কাপড়ে আপনার কাছে যেতে পারি।" ছোটলাট এই কথা শুনে বলে পাঠালেন "আপনি যেমন বেশে আছেন তেমনি বেশেই আসুন, সাজ-পোষাকের কোনই দরকার নেই।" বিদ্যাসাগর মশায় তখন খালি গায়ে খালি পায়ে আড়ময়লা কাপড়ে লাটসাহেবের কাছে গিয়ে যা বোঝাবার তা বুঝিয়ে দিয়ে চলে এলেন।

তাঁর পোষাক-আসাকের আড়ম্বর না থাকার দরুণ আবার অনেক জায়গায় অনেক মজার ব্যাপারও ঘট্‌তো।

একটা ঘটনার কথা বলি। একবার তিনি ইস্কুল দেখ্‌বার জন্যে হুগলী জেলার এক পাড়া গাঁয়ে গেছ্‌লেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের তখন চারদিকেই নাম। সে দেশের ছেলে, বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—সকলে তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে ছুটে এলো। সকাল থেকেই ইস্কুল বাড়ীর কাছে ভীড় জম্‌তে স্থরু হয়ে গেল। কাছাকাছি যে-সব বাড়ী ছিল তার ছাদের উপর, জানালার পাশে, দরজার গোড়ায়, দরদালানে, ছেলে-মেয়েরা আর গিন্নী-বান্নীরা গিয়ে জমায়েত হলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের পৌঁছুতে কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেল। যারা রোদে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভারী কষ্ট হতে লাগ্‌লো। তবু, যে যেমন দাঁড়িয়েছিল, সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো—বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখ্‌বার তাদের এমনি আগ্রহ! এমন সময় রব উঠ্‌লো "বিদ্যাসাগর মশাই, ঐ আস্‌চেন, ঐ আস্‌চেন!" অমনি যারা কথা কইছিল তারা চুপ করে দাঁড়ালো, যারা একটু আড়ালে পড়েছিল, তারা সাম্‌নে এগিয়ে এলো। সকলেরই চোখ্‌ রাস্তার উপর,—কখন্‌ বিদ্যাসাগর আস্‌বেন। বিদ্যাসাগর এলেন। সাম্‌নে দিয়ে চলে যেতে লাগ্‌লেন, কিন্তু মেয়েরা কেউ তাঁকে দেখ্‌তে পেলে না, কেউ মান্‌লে না যে বিদ্যেসাগর এলেন। একটি গিন্নী-বান্নী গোছের স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁ গা, বিদ্যেসাগর কই? তিনি কি এলেন না?" একজন বল্‌লেন "ওই যে বিদ্যাসাগর মশায়।"



The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গিন্নীটি তখন চোখদুটি কপালে তুলে বিদ্যাসাগর মশায়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, আর বল্লেন, "ও আমার পোড়া কপাল! এই মোটা চাদর-গায়ে উড়ে বেহারা দেখ্বার জন্যে রোদে ভাজা-ভাজা হলুম! না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা চাপ্‌কান!"

বিদ্যাসাগর মশায় ইস্কুল নিয়েই যে মেতে রইলেন, তা নয়। ছেলেমেয়েদের জন্যে মেহনত করে ভাল ভাল বই লিখ্‌তেও লাগ্‌লেন। খান কয়েক বই তিনি আগেই লিখে ফেলেছিলেন, এখন আরো বেশী করে লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। তখনকার দিনে ভাল বাংলা বই ছিল না বল্লেই হয়। এখন যেমন গাদা গাদা বই—তার কোন্ খানা ফেলে কোন্ খানা পড়ি ঠিক পাই নে, তখন এ রকম ছিল না। তখন ভাল বই না থাকার দরুণ ছেলেমেয়েদের বাংলা পড়াই হোত না। বিদ্যাসাগর মশায় এজন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, যা পড়ে তোমরা অ আ আর ক খ শিখেছ, সেই বর্ণপরিচয় তিনিই ছেলেদের জন্যে লিখ্‌লেন। যতদিন এ বই বেরোয় নি, তত দিন "শিশুবোধক" বলে এক খানা সেকেলে বই থেকে তখনকার ছেলেদের অক্ষর পরিচয় হোত। তাতে ভারী অসুবিধে হোত। ছেলেদের বানান শেখ্‌বার জন্যে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগও তিনি বার করেন। এই

দু'খানি বই প্রায় ৭০ বছর আগে প্রথম বেরিয়েছিল। সেই থেকে আজ অবধি চলে আস্‌ছে। ছেলেদের জন্যে বোধোদয়, ঋজুপাঠ, চরিতাবলি, কথামালা, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী এই রকম আরও অনেক বই তিনি লিখেছিলেন। এ ছাড়া বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস এই ধরণের আরও খানকয়েক শক্ত বই তিনি লিখেছিলেন। তাঁর এ সব বই আজকালের দিনে পুরাণ আর সেকেলে হয়ে পড়েছে বলে অনেক ছেলে সে সব পড়তে চায় না। কিন্তু তিনি এ সব বই যদি না লিখ্‌তেন, তা হলে তখনকার ছেলেরা বাংলা মোটেই শিখ্‌তে পারতো না। তোমরা যে বাংলা এখন পড় আর লেখ, বিদ্যাসাগর মশাই তার গোড়া বেঁধে দিয়ে যান। ভেবে দেখ একবার, এই কাজটি করেই তিনি আমাদের কত উপকার করে গেছেন।

ইস্কুলের ছেলেরা তাঁর বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। পরীক্ষা করবার জন্যে যখন ইস্কুলে যেতেন, তখন তিনি ছিলেন বেজায় কড়া। কিন্তু অন্য সময়ে তিনি ছেলেদের সঙ্গে ঠিক ছেলে-মানুষের মতো মেশামিশি করতেন। একবার ভারী মজা করেছিলেন। একদিন সকালবেলাই তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, কি এক জরুরী কাজে। সেদিন আবার ১০ টার সময়েই কলেজে হাজির হতে হবে। কাজেই, নাওয়া

খাওয়ার জন্যে আর বাড়ীতে না গিয়ে কলেজের একটা মেসে ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই বলা না কওয়া, রান্নাঘর থেকে খানিকটা তেল নিয়ে, গায়ে মাথায় জুব্ড়ে, দু'ঘটি জল ঢেলে নেয়ে ফেল্লেন। তার পর ছেলেদের সঙ্গেই বসে গেলেন খেতে। কারো পাত থেকে এক খাবা ভাত—কারো থালা থেকে দু'খানা ভাজা—কারো বাটী থেকে একখানা মাছ তুলে নিয়ে গপাগপ্ করে খেয়ে তখনি কলেজে দৌড় দিলেন। মাষ্টাররা আর ছেলেরা তো অবাক্। তারপর কিন্তু কলেজে গিয়েই দেখ্লে যে আর সে-ভাব নেই—তখন একেবারে বেজায় কড়া।

গরমের দিনে তোমরা এখন প্রায় দু'মাস করে ছুটি পাও। এ ছুটিতে তোমাদের কতই না আমোদ! কিন্তু এই ছুটির নিয়ম কে করেছিলেন জানো? বিদ্যাসাগর মশায়ই করেছিলেন। গরমের সময় ছেলেদের বড্ড কষ্ট হয় দেখে, সাহেবদের অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি দুমাস করে গ্রীষ্মের ছুটির নিয়ম করেন। সেই নিয়ম আজো চলে আস্ছে।

প্রিন্সিপাল আর ইন্স্পেক্টার হয়ে তিনি কাজও করলেন যত, তাঁর নামও হোল তত। আরো বেশী দিন যদি এই পদে থাক্তেন, তাহলে তিনি আরও বেশী কাজ

করতে পারতেন। কিন্তু তা হোল না। সাত-আট বছর কাজ করে তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন। তিনি কি রকম তেজী ছিলেন, তার পরিচয় তোমরা আগেই কতক কতক পেয়েছ। কাজে বাধা পেয়ে গোড়াতে তিনি একবার চাকরি ছেড়ে ছিলেন। এতদিন তিনি সকলের কর্ত্তা হয়ে নিজের মনের মতো কাজ করে আস্‌ছিলেন। কোন বাধা ছিল না। এখন হঠাৎ এক সাহেব তাঁর উপরে বসে নিয়ম করতে চাইলেন যে, ছেলেরা আরো বেশী করে মাইনে না দিলে কলেজে পড়তে পাবে না। বিদ্যাসাগর মশায় ছিলেন গরীবের বন্ধু। তিনি আপত্তি করলেন। এই নিয়ে তর্কাতর্কি চল্‌লো। শেষে তিনি একদিন বিরক্ত হয়ে কাজে জবাব দিয়ে বস্‌লেন। ৫০০৲ টাকা মাইনের চাকরি, আর সেই সঙ্গে এত বড় পদ, এক কথায় ছেড়ে দিলেন। তাঁর সাহস দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বন্ধুরা সকলেই চাকরি ছাড়তে কত বারণ করলেন। বড় বড় সাহেবরা এমন কি ছোটলাট পর্য্যন্ত কত উপরোধ অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোনই ফল হোল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর চাকরি করবেন না।

এত টাকা মাইনের চাকরি হঠাৎ ছেড়ে দেওয়াতে তাঁর আয় কমে গেল বটে, কিন্তু খরচ আগের মতোই বেড়ে চল্‌লো। এজন্যে তাঁকে যে অসুবিধায় পড়তে হোল না, তা নয়। তবে

সে বেশী দিনের জন্যে নয়। শীগ্‌গির তাঁর অবস্থা ফিরে গেল। কলেজের পড়া শেষ করে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বই লেখার দিকেও মন দিয়েছিলেন—অবিশ্যি টাকা রোজগারের মতলবে নয়, তখন ভাল বই ছিল না বলে, সেই অভাব মেটাবার জন্যে। সে কথা তোমাদের আগেই বলেছি, আর তাঁর খানকতক বইয়ের নামও করেছি। এর ভেতর তিনি আরও অনেকগুলি বই লিখে ফেলেছিলেন। প্রায় ৫০ খানার বেশী হবে। তখনকার দিনে ৫০ খানা বই বড় যা-তা কথা নয়। সেই সকল বইয়ের খুব আদর হতে লাগ্‌লো। আর বিক্রী হয়ে খুব টাকাও আস্‌তে লাগ্‌লো। সে বড় সামান্য টাকা নয়। কত টাকা শুন্‌বে? শেষাশেষি তাঁর বই বিক্রীর আয় বছরে ত্রিশ হাজার টাকার বেশী দাঁড়িয়েছিল। এ ছাড়া তিনি এর ভেতর 'সংস্কৃত প্রেস' বলে একটা বড় গোছের ছাপাখানাও করেছিলেন—তা থেকেও অনেক টাকা লাভ হোত। তবে আর তাঁর ভাবনা কি? অপর লোক হলে এই সব থেকে অনেক বিষয় করে ফেল্‌তো, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় সে ধরণের ছিলেন না। তাঁর মন, কি রকম দরাজ ছিল, তা তাঁর ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়ার সময়েই তোমরা দেখেছ। তখন তো তিনি একেবারেই গরীব ছিলেন। আর এখন? এতদিন ধরে তো তিনি মাইনেই পেয়ে এসেছিলেন

পাঁচশ টাকা করে। এখন তো দু-হাতে দান করতে সুরু করেছিলেন।

চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় তাঁর দান-খয়রাত যে কমে গেল তা নয়, বরং দেশের কাজে তিনি আরো বেশী করে লেগে গেলেন। অনেক টাকা খরচ করে আরো কত ইস্কুল, পাঠ-শালা আর কলেজ বসালেন। কল্‌কাতাতে থেকে গরীব ছেলেরা যাতে পড়তে পায় সেজন্যে একটি বড় কলেজ খুলে দিলেন। এ কলেজটি তোমরা হয় তো দেখে থাক্‌বে। মেট্রোপলিটান্‌ কলেজ—এখন যার নাম "বিদ্যাসাগর কলেজ"—এটি তাঁরই কীর্ত্তি। ছাত্রদের তিনি অভিভাবক ছিলেন। তিনি যে কত ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিয়ে গেছেন তা গুণে শেষ করা যায় না।

গরীবদের তো তিনি মা-বাপ ছিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে কত লোককে যে তিনি কত রকমে সাহায্য করতেন তার কোন ঠিকানাই নেই। যে যখন যা চাইতো, সে তাই পেতো। চেনা-অচেনা, ইতর-ভদ্র, তার কোন বাছ-বিচার ছিল না। যখন যেখানে যেতেন, সঙ্গে করে চক্‌চকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, পয়সা, আর নূতন কাপড়ের বস্তা এই সব সঙ্গে নিতেন। আর নিতেন ওষুধ। যে খেতে পায় না তাকে টাকা-পয়সা দিতেন, যার কাপড় নেই তাকে কাপড় দিতেন,

যে অসুখে ভুগ্ছে তাকে পথ্য দিতেন, ওষুধ দিতেন। এই রকমে তিনি যখন যেখানে থাকৃতেন, গরীবদের মা-বাপ হয়ে বস্তেন। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যেতো—"দয়ার সাগর এসেছেন"। যখন চাকরিতে ছিলেন, তাঁকে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে হোত। পাল্কি করে তিনি যেতেন। যদি দেখ্তেন যে কেউ অসুখ করে রাস্তায় পড়ে রয়েছে—চল্তে পারছে না, তিনি তাকে পাল্কিতে তুলে নিতেন আর নিজে হেঁটে যেতেন। তার পর তাকে কোন ভাল জায়গায় পৌঁছে দিয়ে, তার ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে তবে যেতেন। এই রকম করে তিনি গরীব-দুঃখীকে কত বেশী যে আপনার করে নিয়েছিলেন তা আর কি বল্ব। তাঁর যে কত বড় দরাজ মন ছিল আর তিনি গরীব-দুঃখীর যে কি রকম বন্ধু ছিলেন, সে-সম্বন্ধে অনেক চমৎকার চমৎকার গল্প আছে, তার কয়েকটি তোমাদের শোনাচ্ছি। এগুলি কিন্তু গল্প নয়, সব সত্যি ঘটনা।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গল্প

(১)

একবার তাঁর বাসার সমুখে একজনের চাকরের কলেরা হয়। যার চাকর সে ভদ্রলোক চাকরটিকে রাস্তায় বার করে দেন। লোকটি রাস্তায় পড়ে ছট্‌-ফট্‌ করতে থাকে; এমন কেউ ছিল না যে মুখে একটু জল দেয়। এই সংবাদ বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কানে গেল, তিনি তখনি গিয়ে লোকটিকে বুকে করে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় এনে শুইয়ে দিলেন, আর ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। তাঁর সেবা শুশ্রূষায় লোকটি বেঁচে গেল।

(২)

মধুপুরের কাছাকাছি কার্‌মাটড়ে তিনি একটি বাড়ী করেছিলেন। অসুখ-বিসুখ করলে সেখানে গিয়ে থাকৃতেন। একবার সেখানে আছেন, এমন সময় একদিন সকালে এক মেথর এসে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁকে বল্‌লে "আমার ঘরে মেথরাণীর কলেরা হয়েছে; বাবা তুমি কিছু না করলে তো আর উপায় নেই"। তাঁর নিজেরই তখন অসুখ, তবু কি তিনি

চুপ করে থাক্‌তে পারেন ? অমনি তিনি একজন চাকর সঙ্গে করে ওষুধের বাক্স আর একটা বসবার মোড়া নিয়ে মেথরের ভাঙ্গা ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। সমস্ত দিন সেই কলেরা রোগীর বাহ্যে বমির ভেতর বসে থেকে, তার চিকিৎসা করতে লাগ্‌লেন। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সেখানে থেকে রোগীকে নিরাপদ করে দিয়ে বাড়ী ফির্‌লেন।

(৩)

একবার তিনি বাড়ী থেকে কল্‌কাতায় আস্‌ছিলেন। একটা খোলা মাঠের কাছে দেখ্‌লেন, একটি চাষাভুষো বুড়ো মাথায় একটা মস্ত মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগর মশায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন ? লোকটি বল্‌লে যে তার বাড়ী সেখান থেকে এখনো দু'তিন ক্রোশ দূরে। তার ছেলে তার মাথায় এই মোট চাপিয়ে দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়েছে। সে এখন চল্‌তে পারছে না। বুড়োর কষ্ট দেখে আর তার উপর তার ছেলের নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে বিদ্যাসাগর মশায়ের চোখে জল এল। তিনি তখনি বুড়োর মাথা থেকে মোটটি নিজের মাথায় তুলে নিলেন আর তাকে সঙ্গে করে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে তার মোট পৌঁছে দিয়ে, হেঁটে কল্‌কাতায় এলেন।

(৪)

বিদ্যাসাগর মশায় অনেক ধনীর বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন। একদিন এক ধনীর বাড়ীতে যাচ্ছেন, এমন সময় এক মুদি এসে তাঁকে নমস্কার করে তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে ধরলো। এই মুদিটি তাঁর আগেকার চেনা আর তাঁকে 'খুড়ো' 'খুড়ো' বলে ডাক্‌তো। মুদি আদর করে বলায় তিনি তার সঙ্গে গেলেন। তার দোকানের সাম্‌নে ঘাসের উপর বসে বিদ্যাসাগর মশায় হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন আর মুদির সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলেন, এমন সময় যে ধনীটির বাড়ী তিনি যাচ্ছিলেন, সেই ধনী ভদ্রলোকটি প্রকাণ্ড এক জুড়ি-গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খেতে বেরুলেন। বেরিয়েই দেখ্‌লেন বিদ্যাসাগর মশায় ঘাসের উপর বসে। তখন ধনী লোকটি একটু মুস্কিলে পড়লেন। বিদ্যাসাগর মশায়কে এড়িয়েও যেতে পারেন না, অথচ মুদির সাম্‌নে নেমে তাঁকে সম্মান দেখালেও খেলো হোতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়কে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য তাঁর ছিল না। গাড়ী থেকে নাম্‌তেই হোল। তার পর আর এক সময়ে দেখা হওয়ায় বিদ্যাসাগর মশায় তাঁকে বল্‌লেন "সেদিন বড় বিপদে পড়েছিলে, না?" ধনী বন্ধুটি বল্‌লেন, "আপনি পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে ও-রকম ভাবে বসেন, ওতে বড় লজ্জা বোধ হয়।" তিনি উত্তর করলেন

"লজ্জা বোধ হয়, আমার সঙ্গে পরিচয় না রাখ্‌লেই তো সব চুকে যায়! তা হোলে লজ্জা পেতে হয় না! সে গরীব বলে তাকে ঘেন্না করতে হবে? গরীব বড় মানুষ সবই আমার সমান।"

(৫)

সেই ধনী লোকটির বাড়ীতে একদিন তিনি বসেছিলেন; এমন সময়ে শুন্‌তে পেলেন নীচে দাঁড়িয়ে একজন ভিখিরী ভিক্ষের জন্য চেঁচাচ্ছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, কেউ তাকে ভিক্ষে দিলে না দেখে বিদ্যাসাগর মশায় ধনীটিকে বল্‌লেন "এই যে একটা লোক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, তুমি কি তা শুন্‌তে পাও না?" ধনীটি ভাব্‌লেন, চেঁচামেচির জন্যে বিদ্যাসাগর মশায় বিরক্ত হয়েছেন। এই ভেবে তিনি ডাক দিলেন "কৈ হ্যায়?" অমনি যমদূতের মতো দরোয়ান এসে বাবুজীর সাম্‌নে হাজির। হুকুম হোল, ভিখিরীটাকে তাড়িয়ে দাও। দরোয়ান তাড়াবার হুকুম পেয়েছে, সে ভিখিরীকে আধমারা করে গলা টিপে দরজার বার করে দিলে। বিদ্যাসাগর মশায় এই সব কাণ্ড দেখ্‌লেন। তাঁর প্রাণ একেবারে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লো। তিনি তখনি উঠে পড়লেন। ধনীটি বল্‌লেন "যান কোথায়?" তিনি

"আস্‌চি" বলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সেই ভিখিরীটির পেছু নিলেন। একটু গিয়েই তাকে ধরলেন। একটি টাকা বার করে ভিখিরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কি?" সে বল্‌লে "টাকা।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে কত পয়সা হয়?" ভিখিরী জবাব দিল। তিনি তখন তাকে বল্‌লেন "বাপু, তুমি যদি রাজী হও যে ও-বাড়ীতে আর কখন ভিক্ষে চাইতে যাবে না, তা হোলে এই টাকাটি তোমায় দি।" এই বলে তিনি তার হাতে টাকাটি দিয়ে চলে গেলেন। খানিকটা গিয়ে ভাব্‌লেন ভিখিরী একেবারে একটা টাকা পেয়েছে, হয় তো না খেয়ে মরবে, তবু টাকাটা ভাঙ্গাবে না। এই ভেবে ফিরে এসে, তার হাতে আর দুটো পয়সা দিলেন। সেই থেকে সেই ধনীটির বাড়ী যাওয়া তিনি বন্ধ করে-দিলেন। তিনি নিজের বাড়ীতে কখনো দরোয়ান রাখেন নি। দরোয়ান রাখার কথা উঠ্‌লেই তিনি বল্‌তেন, "তা হোলে তো আমার বাড়ীতে ভিখিরী একমুঠো ভিক্ষে পাবে না। অনেক ভদ্রলোককেও হয় তো দোর গোড়া থেকে ফিরে যেতে হবে। তার চেয়ে মরণ ভাল।" তিনি বাড়ীর সকলকে বলে রেখেছিলেন "যদি শুনতে পাই, কোন লোককে আমার বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, তা হোলে তোমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দোব।"

(৬)

আগেই বলেছি, ইস্কুলের ছেলেরা তাঁর ভারী আদরের সামগ্রী ছিল। দোষ করলে ছেলেদের তিনি শাসন করতেন বটে, কিন্তু অল্পতেই আবার গলে যেতেন। একবার অনেকগুলো ছেলেকে দুষ্টুমির জন্যে তিনি ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন। ছেলেরা তার পর দিন সকালে জোট্ বেঁধে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির। ভয়ে ভয়ে তাঁর সাম্নে গিয়ে হাত জোড় করে সকলে মাপ চাইলে। এই ছেলেদের উপর তিনি ভারী রেগেছিলেন, কিন্তু তাদের এই রকম ভাবে মাপ চাইতে দেখে, তাঁর রাগ কোথায় চলে গেল। তিনি অল্প অল্প হেসে বল্লেন "যা, আর দুষ্টুমি করিস্ না; এবার তোদের মাপ করলুম।" ছেলেরা তো মহা খুসী। তখন বেলা প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। ছেলেরা বাড়ী ফেরবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নাম্তে নাম্তে, একজন আর একজনকে বল্লে "কি কঠোর প্রাণ ভাই, এতখানি বেলা হোল, তা বল্লে না, একটু জল খেয়ে যা।" কথাটা বিদ্যাসাগর মশায়ের কাণে গেল। তিনি অমনি চট্ করে এসে তাদের আট্কালেন, বল্লেন "ঠিক্ বলেছিস্, আমার কঠোর প্রাণই বটে, অন্যমনস্কে তোদিগে একটু খেতেও বলি নি; আয়, আয়, একটু-একটু জল খেয়ে যা।" ছেলেরা তো মহা লজ্জায় পড়ে গেল।

কেউ, হাত জোড় করে মাপ চাইলে, কেউ বা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে গেল। তিনি ফটক বন্ধ করে দিতে বলে, ছেলেদের সবাইকে ধরে নিয়ে উপরে গেলেন, আর সকলকে খাবার খাওয়ালেন। তখন তাঁর সেই হাসি-হাসি শান্ত মুখখানি দেখে একজন ছেলে আর একজনকে ফিস্ ফিস্ করে বললে "এ লোকের রাগ হয় কেমন করে, ভাই?"

(৭)

একবার ছেলেরা তাঁর কাছে পৌষ পার্ব্বণের ছুটি চায়। তিনি ছুটি দিলেন, আর বল্‌লেন "তোমাদের অনেকের বাড়ী তো এখানে নয়, তা হোলে আর এখানে তোমরা পিঠে পাবে কোথায়?" ছেলেরা বল্‌লে—"আপনার বাড়ীতে।" বিদ্যা-সাগর মশায় হেসে বল্‌লেন "বেশ, তাই হবে।" পৌষ পার্ব্বণটা ভালোই কাট্‌লো—ছেলেরা পেট ভরে পিঠে খেলে।

(৮)

একবার তিনি পাল্‌কী করে বাড়ী যাচ্ছিলেন, পথে এক জায়গায় পাল্‌কী থাম্‌লে, একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটি বল্‌লে, "বাবু, একটা পয়সা দেবেন?" তিনি বল্‌লেন "একটা পয়সা কি কর্‌বি?" "কেন, খাবার খাব।" "যদি দুটি পয়সা দি?" "আজ এক পয়সার আর কাল এক পয়সার খাব।" "যদি চার্ পয়সা দি?" "হাটে

আম কিনে গাঁয়ে বেচে দু-আনা করবো, লাভের পয়সা খাব, আসল পয়সায় আবার ঐ রকম করে কেনা-বেচা করবো।" বিদ্যাসাগর মশায় ছেলেটির কথায় ভারী খুসী হলেন। তাকে কিছু বেশী পয়সা দিয়ে বল্‌লেন, "এই পয়সা যদি তুই বাড়াতে পারিস্‌, তোকে টাকা দিয়ে দোকান করে দোব।" বাড়ী থেকে ফেরবার সময় ছেলেটি পয়সা থেকে একটি টাকা করেছে দেখে তাকে দোকান করে দিয়েছিলেন।

(৯)

কারমাটারে যখন তিনি থাক্‌তেন, সাঁওতালরাই ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তারা তাঁর সঙ্গে কেউ দাদা, কেউ বাবা, কেউ জ্যাঠা এই রকম সম্পর্ক পাতিয়েছিল। যে যা চাইতো তাকে তিনি তাই দিতেন। অসুখের সময় তাদের বাড়ী গিয়ে খবর নিতেন। কাছে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, ওষুধ খাওয়াতেন। পথ্য তৈরী করে দিতেন। আমের দিনে সকলকে পেট ভরে আম খাওয়াতেন। অনেক সময় বর্দ্ধমান থেকে সীতাভোগ আর কল্‌কাতা থেকে খেজুর নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াতেন। পূজোর সময় তাদের কাপড় দিতেন। সাঁওতালরা তাঁকে একেবারে আপনার লোক মনে করতো। একদিন একটি সাঁওতাল তার এক আত্মীয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে

করে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে যায়। গিয়ে বলে "একে একখানা কাপড় দিতে হবে।" বিদ্যাসাগর মশায় কৌতুক করবার জন্যে বল্‌লেন "কাপড় নেই; আর থাক্‌লেই বা তোকে দোব কেন?" সাঁওতাল বল্‌লে "তা হবে না, কাপড় দিতেই হবে।" বিদ্যাসাগর মশায় বল্‌লেন "কোথায় পাব কাপড়?" সাঁওতাল নাছোড়বান্দা, বল্‌লে "দে তোর চাবি, চাবি খুলে সিন্দুক দেখ্‌বো।" বিদ্যাসাগর মশায় হেসে তাকে চাবিটি ফেলে দিলেন। সাঁওতাল চাবি খুলে দেখে অনেক কাপড়। সে বল্‌লে "বাসরে এই যে কাপড়!" এই বলে সে একখানি ভাল কাপড় বার করে নিয়ে সাঁওতালনীকে দিলে। এতেই বিদ্যাসাগর মশায়ের কত আনন্দ!

(১০)

দেশে একবার যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, বিদ্যাসাগর মশায় নিজের গ্রামে অন্নসত্র খুলেছিলেন। প্রতিদিন অসংখ্য লোক এসে সেখানে খেতো। তাতে যে কত লোকের প্রাণরক্ষা হয়েছিল তা গুণে শেষ করা যায় না। যারা খেতে আস্‌তো, তাদের বেশীর ভাগ লোক নীচু জাতের। বিদ্যাসাগর মশায় নিজেই পরিবেশন করতে লেগে যেতেন। তাঁর দেখাদেখি তখন ভদ্রলোকেরাও পরিবেশনে যোগ দিতেন। তেলের অভাবে স্ত্রীলোকদের মাথার চুলগুলি উস্কোখুস্কো দেখাতো। বিদ্যাসাগর

মশায় প্রত্যেকের জন্য দু'পলা করে তেলের ব্যবস্থা করে দেন। যারা তেল বিতরণ করতো তারা পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম এই সব ছোট জাতকে ছুঁয়ে ফেলে এই ভয়ে তফাৎ থেকে তেল দিত। বিদ্যাসাগর মশায় তাই দেখে নিজের হাতে করে তাদের মাথায় তেল মাখিয়ে দিতেন।

(১১)

একদিন বিদ্যাসাগর মশায় হেদোর কাছে পায়চারি করছিলেন। সেই সময় একটি ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন আর তাঁর চোখ্ দিয়ে জল পড়ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় তাঁকে ডেকে বল্‌লেন "আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?" বিদ্যাসাগর মশায়ের চটি জুতো আর মোটা চাদর দেখে, তাঁকে সামান্য লোক ভেবে ব্রাহ্মণের কোন উত্তর দিতেই ইচ্ছা হোল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় যখন কোন মতে ছাড়লেন না, তখন বল্‌লেন "আমি একজনের কাছে আড়াই হাজার টাকা ধার করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। সে টাকা শুধ্‌তে পারি নি বলে আমার নামে সে নালিশ করেছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "মোকদ্দমা কবে?" ব্রাহ্মণ বল্‌লেন "পরশু।" এই রকম করে ব্রাহ্মণের নাম, মোকদ্দমার নম্বর এই সকল জেনে নিলেন। তারপর চুপি চুপি আড়াই হাজার টাকা তার পরদিন আদালতে জমা করে দিলেন। এদিকে

ব্রাহ্মণ মহাভাবনা নিয়ে আদালতে হাজির হলেন, না জানি আজ তাঁর ভাগ্যে জেলই বা হয়! কিন্তু যখন শুন্‌লেন যে, তাঁর দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে, তখন তাঁর মনটা কি রকম হোল একবার বুঝে দেখ। কিন্তু কে যে তাঁকে ঋণের দায় থেকে বাঁচালেন, তাঁর নাম প্রাণপণ চেষ্টা করেও তিনি জান্‌তে পারলেন না। ব্রাহ্মণ হর্ষে আর দুঃখে বাড়ী ফিরলেন।

(১২)

একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মশায়ের হাতে এক চিঠি দিলেন। ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, কিছু টাকা চাই। বিদ্যাসাগর মশায়ের এক বন্ধু ঐ চিঠি লিখে ব্রাহ্মণকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিঠি পড়ে বিদ্যাসাগর মশায় তো একেবারে চটেই আগুন। তিনি ব্রাহ্মণের উপর তম্বি করতে লাগ্‌লেন। তাঁর রাগ দেখে আর কথাবার্ত্তা শুনে ব্রাহ্মণ টাকার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন, তখন বিদ্যাসাগর মশায় বাক্স থেকে একখানা কাগজ বার করে তাতে কি লিখ্‌লেন, আর মুড়ে-সুড়ে ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন। চিঠির জবাব মনে করে ব্রাহ্মণ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সেটা চাদরের খুঁটে বেঁধে নিয়ে দে চম্পট্‌। রাস্তায় বেরিয়ে বিদ্যাসাগর মশায়কে,

আর যে ভদ্রলোক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে অভিসম্পাত করতে করতে চল্‌লেন। অল্প দূর গিয়ে তাঁর ইচ্ছা হোল জবাবটা পড়ে দেখ্‌বার। খুলে দেখেন সর্ব্বনাশ, এ তো চিঠি নয়, এ যে একশ টাকার একখানা নোট! নোটের পিঠে বিদ্যাসাগর মশায় নিজের নাম সই করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ তো অবাক্।

(১৩)

অনেক গোড়ার কথা। বিদ্যাসাগর মশায় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সবে পঞ্চাশটি টাকা মাইনের চাকরি করছেন। কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজে ৯০৲ টাকার এক চাকরি খালি হোল—আর বিদ্যাসাগর মশায়কেই যোগ্য মনে করে সেই চাকরিটি দেওয়া হোল। কিন্তু আশ্চয্যি এই যে, তিনি এই বেশী মাইনের চাকরিটি নিতে চাইলেন না। এই চাকরিটি তারানাথ বাচস্পতি বলে আর একজন পণ্ডিতকে যাতে দেওয়া হয়, সে জন্যে কলেজের কর্ত্তাদের তিনি অনুরোধ করলেন। তাঁর নিজের তো ৫০৲ টাকার একটি চাকরি আছে—এতেই তাঁর একরকম চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাচস্পতি মশায়ের চাকরি নেই, তাঁকেই এই চাকরিটি করে দেওয়া চাই। তিনি বলাতে বাচস্পতির এই চাকরিটি হোল। কিন্তু আর এক মুস্কিল। বাচস্পতি থাকেন কালনায়, ৫০ মাইল দূরে।

তাঁকে খবর দেওয়া যায় কি করে? আজ শনিবার, সোমবার এসে কাজে না লাগ্‌লেই নয়। পত্র পাঠালে কোন কাজ হবে না। তিনি তখন করলেন কি, বাচস্পতিকে সঙ্গে করে আন্‌বার জন্যে তিনি সেই রাত্রে হেঁটে কাল্‌না রওনা হলেন; সমস্ত রাত পথ চলে, পরদিন বাচস্পতির বাড়ীতে পৌঁছুলেন। বাচস্পতি মশায় তাঁকে হঠাৎ দেখে প্রথমটা আশ্চয্যি হলেন, তার পর যখন সকল কথা শুন্‌লেন তখন একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন, বলে উঠ্‌লেন "ধন্য বিদ্যাসাগর, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা।"



The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

বিদ্যাসাগর-জননী

মা ও ছেলে

বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তোমরা এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড় নি নিশ্চয়। তাঁর গুণের কথা শুন্‌তে বস্‌লে কি এক দিনে শেষ হয়! যত শুন্‌বে, ততই ভালো লাগবে, যত পড়বে ততই আরো পড়তে চাইবে। তাঁর এত সব গুণের কথা তোমরা শুন্‌লে, কিন্তু আর একটি তাঁর মস্ত বড় গুণ ছিল, সেটি বাপ-মায়ের উপর ভক্তি আর ভালবাসা। বাপ-মাকে তিনি কি রকম যে ভক্তি করতেন, কত বেশী যে ভালবাসতেন, তা আর তোমাদের কি বল্‌বো। তাঁদের তিনি দেবতার চেয়েও বড় বলে মান্‌তেন। বিদেশে যখন থাক্‌তেন, বাপ-মায়ের ছবির সাম্‌নে সকালে উঠে নমস্কার না করে ঘর থেকে বেরুতেন না। তাঁদের হুকুম, তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় হুকুম ছিল। তাঁদের ইচ্ছা তিনি প্রাণ দিয়েও পালন করতেন; হাজার কষ্ট, হাজার বিপদ থাক্‌লেও পেছ্‌-পা হতেন না। একবারের একটি ঘটনা তোমাদের বলি। তখন তাঁর বয়স ২২।২৩ বছর। সেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঢুকেছেন। দেশে তাঁর ছোট ভাইয়ের বে হবে, সে জন্যে তাঁর মা তাঁকে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ী আস্‌বার জন্যে লিখে পাঠালেন। ভায়ের বে হবে, তায় আবার মা ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি

কি আর থাকতে পারেন! তিনি ছুটি চাইলেন। কিন্তু সাহেব ছুটি দিলেন না। কাজেই আর তিনি বাড়ী যান কি করে! কিন্তু মন তাঁর ভারী খারাপ হয়ে গেল। মা বাড়ী যেতে বলেছেন, কিন্তু তিনি যেতে পারলেন না। না গেলে মায়ের কষ্ট হবে, এই ভেবে তিনি সমস্ত রাত না ঘুমিয়ে কেঁদে কেঁদে কাটালেন। পর দিন সকাল বেলা ঠিক করলেন যে বাড়ী তাঁকে যেতেই হবে, তা ছুটি তিনি পান বা না পান। তিনি সাহেবকে গিয়ে বল্‌লেন "আমার মা আমায় বাড়ী যেতে বলেছেন, আমায় যেতেই হবে, ছুটি দিন্, আমি বাড়ী যাই; ছুটি না দেন, আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চল্লুম।" মায়ের প্রতি তাঁর এই রকম ভক্তি দেখে সাহেব আশ্চয্যি হয়ে গেলেন, আর তখনি তাঁকে ছুটি দিলেন। ছুটি পেয়েই তাঁর মহা আনন্দ। কিন্তু তখন বর্ষাকাল। সেদিন খুব জোরে বৃষ্টি পড়্‌ছিল আর থেকে থেকে মেঘ কড়্ কড়্ করে বিদ্যুৎ হান্‌ছিল। তিনি সে সকল গ্রাহ্য না করে, মাকে মনে মনে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়্‌লেন। ঝড়-বৃষ্টির ভেতর অনেক কষ্টে পথ চলে, পরদিন সকালে দামোদরের পাড়ে এসে পৌঁছুলেন। পৌঁছে দেখ্‌লেন সর্ব্বনাশ! এ যে ভয়ানক বন্যা! জলের এত টান, যে হাতীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়! স্রোতের সামনে এগোয় কার সাধ্যি! তিনি তো মহা ভাবনায়

পড়লেন, কারণ নৌকো নেই যে পার হবেন। সেদিন কিন্তু বাড়ী তাঁকে পৌঁছুতেই হবে। সেই দিনই যে বে! মা তাঁর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন—না গেলে তাঁর দুঃখের সীমা থাক্‌বে না। তিনি আর থাক্‌তে পারলেন না। নেই বা রইলো নৌকো, হোলই বা বন্যা! এ সব বাধা তাঁর কাছে বাধাই নয়। তিনি 'মা' 'মা' বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে সব লোক পার হবার জন্যে বসেছিল তারা "হায় হায়, সর্ব্বনাশ হোল" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তাঁর কোন বিপদই হোল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি সেই দুরন্ত নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে ও-পারে গিয়ে উঠ্‌লেন। ও-পারে উঠেই আবার চল্‌তে লাগ্‌লেন। এখনো অনেক পথ যেতে হবে। সমস্ত দিন চলে বিকেলবেলা আর একটা নদীর কাছে এলেন। এটাকেও সাঁত্‌রে পার হলেন। রাস্তার মাঝে যেখানে সন্ধ্যে হোল, সেখানে ভয়ানক চোর-ডাকাতের ভয়। তিনি মনে মনে মাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন আর পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন। এই রকম করে রাত্রি ৯ টার সময় গিয়ে বাড়ী পৌঁছুলেন। বর ততক্ষণে বে করতে চলে গেছে। তাঁর মা কিন্তু তিনি তিনি না আসার দরুণ ঘরের দোর বন্ধ করে, না খেয়ে-দেয়ে পড়ে আছেন। বাড়ীতে পা দিয়েই "মা মা, আমি এসেছি" বলে তিনি ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর সাড়া পেয়ে মা ঘর

থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন মাও কাঁদেন, ছেলেও কাঁদেন। শেষটায় কান্না থাম্‌লে, মা আর ছেলে এক সঙ্গে খেতে বস্‌লেন। মায়ের উপর এ রকম ভক্তি আর ভালবাসার কথা তোমরা শুনেছ কি?

তাঁর মাও ছিলেন একটি দেবী। লোকের দুঃখ কষ্ট দেখ্‌লে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তো। গরীব-দুঃখীদের তিনি অন্নপূর্ণার মত অন্ন বিতরণ করতেন। আপদ বিপদে প্রাণ দিয়ে লোকের উপকার করতেন। দুপুর বেলা, রান্নাবান্না সেরে সকলকে খাইয়ে তিনি দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন। হেটোরা হাট থেকে ফেরবার সময় তাঁর দরজার সুমুখ দিয়ে গেলে তিনি তাদের ডেকে খাওয়াতেন। কারো মুখখানি শুক্‌নো দেখ্‌লে বল্‌তেন "আহা, তোর বুঝি খাওয়া হয় নি। আয়্ আয়্, আমার বাড়ীতে খাবি আয়।" তাঁর প্রাণটি এই রকম কোমল ছিল। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর মস্ত কাজ। কারো অসুখ করেছে, তাকে ওষুধ দিচ্ছেন; কারো ঘরে চাল নেই, তাকে চাল দিচ্ছেন; কারো কাপড় নেই—ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছে, তাকে কাপড় দিচ্ছেন; এই রকম কাজেই তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাট্‌তো। অনেক সময় তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখা যেতো যে, তিনি হয় ডোম পাড়ায়, না হয় হাড়ি পাড়ায়, না হয় দুলে পাড়ায়

কারো না কারো দরজার কাছটিতে বসে আছেন। বসে কারো বা দুঃখের কাহিনী শুন্‌ছেন, কাউকে বা ওষুধ দিচ্ছেন, কারো বা পথ্যের ব্যবস্থা করছেন। সাগু আর মিছরী অনেক সময় তাঁর সঙ্গেই থাক্‌তো। যাদের রাঁধ্‌বার কেউ নেই, বাড়ী থেকে পথ্য তৈরী করে নিয়ে গিয়ে তাদের খাইয়ে আস্‌তেন।

গ্রামের অনেক চাষা-ভূষো এক বেলা খেয়ে কষ্টে দিন কাটাতো। ভগবতী দেবী তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। অনেককে আবার টাকা ধারও দিতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কাছ থেকে ফিরে পাবার আশা করতেন না। টাকার দরকার পড়লে কখন কখন তাগাদা করতে বেরুতেন। টাকা শুধতে না পেরে কেউ যদি কাঁদ্‌তো, তিনি তাদের সান্ত্বনা দিতেন, বলতেন, "অবস্থা ভাল হয়, দিবি—না হয়, না দিবি, তার জন্যে কাঁদিস্‌ কেন?" আবার কারো কারো উপর খুব চটে গিয়ে টাকা চাইতেন, বল্‌তেন, "তোরা যদি টাকা না দিবি, তবে আমি আর কি করে টাকা ধার দোব?" তাঁকে রাগতে দেখে তারা নানা রকমে তাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করতো। কেউ বা দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে দুঃখের কথা জানাতো, কেউ বা বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম করে তাঁর মঙ্গল কামনা করতো, কেউ বা হলুদ বেটে তাঁকে মাখিয়ে দিত। কেউ বা তাঁর আঁচলে মুড়ি, নারকেল, বাতাসা এই সকল জলখাবার

বেঁধে দিত। তখন কি তাঁর রাগ থাক্‌তো, না টাকা আদায়ের কথা মনে থাক্‌তো! তিনি বল্‌তেন, "ভাল, ভাল, যখন সুবিধে হয়, তখন দিস্‌,—আজ কিন্তু তোরা আমার বাড়ীতে প্রসাদ পাস্‌।" এই রকমে, টাকা আদায়ের বদলে, সকলকে নেমন্তন্ন করে বাড়ী ফিরতেন।

একবার বিদ্যাসাগর মশায় খানকয়েক লেপ তৈরী করে বাড়ীর জন্যে পাঠিয়ে দেন। ভগবতী দেবী শুন্‌লেন যে, গ্রামের অনেকে লেপের অভাবে কষ্টে রাত কাটায়। তিনি লেপ ক'খানি বিলিয়ে দিলেন, আর ছেলেকে লিখ্‌লেন, "আমি লেপগুলি গরীবদের দিয়েছি, তুমি আমাদের জন্য খানকয়েক কম্বল পাঠিয়ে দাও।" বিদ্যাসাগর মশায় বাড়ীর জন্য আর এক প্রস্থ লেপ পাঠালেন আর মাকে লিখ্‌লেন, "মা, আপনার আর ক'খানি লেপ চাই বল্‌বেন, আমি আহ্লাদের সহিত শিগ্‌গির আপনাকে পাঠিয়ে দোব।" যেমন মা, তেমনি ছেলে। মায়ের শান্ত মুখখানি স্নেহ-ভালবাসায় সর্ব্বদা ঢল-ঢল করতো। যিনি যত বড়ই হোন্‌, তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে ভক্তিতে মাথা নীচু হয়ে যেতো; আর আনন্দে প্রাণ ভরে যেতো। একবারের একটি ঘটনা বলি।

হ্যারিসন্‌ সাহেব বলে একজন খুব বড় দরের সাহেব বীরসিংহ অঞ্চলে তদারকে যান। বিদ্যাসাগর মশায় তখন

বাড়ীতে ছিলেন। তিনি গিয়ে মাকে জানালেন যে, এক ছেলেমানুষ সাহেব এসেছেন। মা শুনে বল্‌লেন, "তা সাহেবের ছেলেটিকে একবার আমাদের বাড়ীতে আন্‌বি নে? তাকে একবার বাড়ীতে এনে কিছু খাওয়াবি নে?" বিদ্যাসাগর মশায় সাহেবকে গিয়ে মায়ের কথা বল্‌লেন। সাহেবটি ছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের বন্ধু, আর ভারী ভাল মানুষ। সাহেব বল্‌লেন, "তিনি নিজে আমায় নেমন্তন্ন না করলে আমি যাব না—খাবও না।" মা তখন নিজে তাঁকে চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করলেন। চিঠি পেয়ে সাহেব ভারী খুসী হয়ে নেমন্তন্ন খেতে এলেন। এসে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি সাহেবের মাথার হাত দিয়ে ছেলের মতো করে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন। সাহেব বাংলা বুঝ্‌তে পারেন শুনে তাঁর ভারী আহ্লাদ। তিনি তাঁর কাছে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন। পঞ্চাশ রকম তরকারী আর ভাত আর তার সঙ্গে দই সন্দেশ, পায়স্ পিঠে মহা আনন্দে সাহেব খেতে লাগ্‌লেন। যেটির পর যেটি খেতে হয়, মা তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। সাহেব তাঁর স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন, ভালবাসায় একেবারে গলে গেলেন। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এমন আমি কখন দেখি নি, এ আমি জীবনে ভুল্‌বো না।"

খাওয়া দাওয়া হলে মায়ের সঙ্গে নানা রকমের গল্প হতে লাগ্‌লো। কথায় কথায় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কত টাকা?" মা একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "কেন, আমার চার ঘড়া ধন।" বিদ্যাসাগর মশায় দাঁড়িয়েছিলেন আর তাঁর পাশে আর তিনটি ভাইও দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের চার জনকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "আমার এই চার ঘড়া ধন।" এই রকম চমৎকার উত্তর শুনে সাহেব তো অবাক্, বল্‌লেন, "ইনি যে-সে নন্, এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়?" এ-কথার আর ভুল নেই। এমন মা না হলে, এমন ছেলে হয় না। মায়ের কথা যখন উঠ্‌তো, বিদ্যাসাগর মশায় বল্‌তেন, "মায়ের আমার এত গুণ যে, তার একশ' ভাগের এক ভাগও যদি আমি পেতুম!"

বিদ্যাসাগর মশায় এত বড় বিদ্বান হয়েছেন, এত তাঁর নাম-ডাক,—রাজা, জমিদার, জজ, মাজিষ্ট্রেট, এমন কি ছোটলাট, বড়লাট পর্য্যন্ত তাঁকে খাতির করেন, কিন্তু মায়ের কাছে তিনি সেই ছেলে-মানুষটি,—মায়ের কাছে ছেলে-মানুষের মতোই তাঁর আব্‌দার। একটি সুন্দর ঘটনা বলি। ছেলের ইচ্ছে হোল মায়ের ছবি তুল্‌তে হবে। তিনি তাঁকে বাড়ী থেকে কল্‌কাতায় আন্‌লেন; বল্‌লেন, "মা, পাক্‌পাড়ার রাজাদের বাড়ীতে একজন খুব ভাল পটো

এসেছে, তাকে দিয়ে তোমার ছবি তুলিয়ে নিতে চাই।” ছবি তোলার কথা শুনে মা বল্‌লেন, “দূর, আমার আবার ছবি কি হবে!” ছেলে বল্‌লেন, “ছবি কি আর তোমার জন্যে? ছবি আমার জন্যে। একখানা ছবি থাক্‌লে, যখন যেখানে থাকি, প্রাণটা কেমন করলে এক একবার দেখ্‌বো।” এ-কথার আর জবাব নেই দেখে মা বল্‌লেন, “তবে তোর যা ইচ্ছে হয়, তাই কর্।” ছেলে তখন বল্‌লেন, “কিন্তু মা, তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে তো, না সাহেবকে এখানে আন্‌বো?” “পটো সাহেব! না বাপু, আমি সাহেবের সাম্‌নে ছবি তোলাতে বস্‌তে পারবো না।” এই বলে মা আবার আপত্তি করলেন। ছেলে বল্‌লেন, “না মা, সে খুব ভাল লোক, আমার একখানা ছবি এঁকেছে, তার দাম নেয় নি, আমাকে খুব ভাল বাসে, তার সাম্‌নে বস্‌তে কোন দোষ নেই।” ছেলে নাছোড়বান্দা দেখে মা বল্‌লেন, “তা তোর যা ইচ্ছে কর্, তবে আমি আর কোথাও যেতে পারবো না বাবা, যা করবি এখানে এনে কর্।” ছেলে বল্‌লেন, “রাজাদের বাড়ীতে সব যোগাড় আছে। সে সব ভেঙ্গে এখানে আন্‌তে গেলে, ছবি হয়তো ভাল হবে না মা।” পাক্‌পাড়ার রাজাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের খুব মেশামিশি ছিল। মা আর কি করেন, ছেলের আব্‌দার শুন্‌তেই হোল; বল্‌লেন, “তুই

যখন ধরেছিস্, তোকে এঁটে উঠ্‌তে পারবো না। তা তোর যা ইচ্ছে কর্‌গে, গেলেও তোর সঙ্গে যাব তো! নিন্দে হলে লোকে তো আর আমার নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে। বল্‌বে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়ার রাজার বাড়ীতে ছবি তোলাতে নিয়ে গেছে।"

আর বল্‌তে হবে না বোধ হয় যে মায়ের ছবি তোলান হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর মশায় একদিন তাঁর মাকে বল্‌লেন, "মা, তোমার তো কোন গয়না নেই! আমার এখন অবস্থা ভাল। আমার ইচ্ছে, তোমার খানকয়েক গয়না গড়াই। তোমার কি কি গয়না পরবার ইচ্ছে হয়?" ভগবতী দেবী বল্‌লেন, "বাবা, অনেক দিন থেকে আমার তিনখানি গয়নার সাধ আছে, তুমি যখন নিজ হতে বল্‌লে, ভালই হোল। দেখ বাবা, দেশের ছেলেগুলো মূর্খ হয়ে যাচ্ছে, তাদের লেখাপড়ার জন্যে একটি বিনে-মাইনের ইস্কুল করে দাও। আর দেখ, গরীব লোকেরা বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধে অকালে মারা যায়, তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে একটি দাতব্য ডাক্তারখানা বসিয়ে দাও। আর বাবা, গরীবের ছেলেরা থাক্‌বেই বা কোথায়, খাবেই বা কোথায়; তাদের থাক্‌বার আর খাবার ভাল ব্যবস্থা করে দাও। অনেক দিন থেকে আমার এই তিনখানি

গয়নার সাধ আছে। তুমি আমার এই সাধ পূর্ণ কর। তাহলেই আমি খুসী হই।”

মায়ের এই উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর পায়ের তলায় পড়ে লুটোপুটি খেয়ে কেঁদেছিলেন। মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে তিনি সেইদিন থেকেই কাজে লেগে গেলেন। তিনি তাঁর মায়ের এই ইচ্ছাগুলি পূর্ণ করে ধন্য হয়েছিলেন। মায়ের নাম অনুযায়ী তিনি ইস্কুলের নাম রাখ্‌লেন “ভগবতী বিদ্যালয়”। সেই ইস্কুল বীরসিংহ গ্রামে এখনো আছে।

শেষ

বিদ্যাসাগর মশায়ের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির তুলনাই হয় না। বাপমায়ের চরণ-সেবা ছাড়া অপর কোন ধর্ম্মই তিনি মানতেন না। তাঁর বাপ-মা শেষ বয়সে যখন কাশীতে ছিলেন, তখন তিনি কিছুদিনের জন্যে সেখানে যান। কাশীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ টাকার জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে ধরে বস্‌লো। এদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর মশায় বল্‌লেন, "কাশীতে আছেন বলেই আপনাদের আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করতে পারি না।" ব্রাহ্মণেরা এই কথায় চটে গিয়ে বল্‌লে, "আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বরও মানেন না?" বিদ্যা-সাগর মশায় তেজের সঙ্গে উত্তর কর্‌লেন, "না। আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।" ব্রাহ্মণেরা চটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনি তবে কি মানেন?" এই কথার উত্তরে বিদ্যাসাগর মশায় কি বলেছিলেন জানো? তিনি তাঁর বাবা আর মাকে দেখিয়ে বল্‌লেন, "আমি কেবল এঁদেরই মানি,—এঁরাই আমার বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা।"

বিদ্যাসাগর মশায়ের গান-বাজনায় তত সখ ছিল না। কিন্তু কেউ 'মা' 'মা' বলে গান করলে তিনি আনন্দে নেচে উঠ্‌তেন। যে গাইতো, তাকে যেন বুকে করে রাখ্‌তে

চাইতেন—তা সে যেই হোক্ না কেন? এক অন্ধ মুসলমান ভিখিরী বেহালা বাজিয়ে গান করতো; তার গানে 'মা' 'মা' কথার খুব ছড়াছড়ি। তাকে ডাকিয়ে তিনি প্রায়ই গান শুন্তেন আর অনেক পয়সা-কড়ি দিতেন। গানের 'মা' 'মা' বুলি শুন্তে-শুন্তে তাঁর দু'-চোখ বেয়ে জল পড়তো। কেউ যদি ভিক্ষে চাইতে এসে বল্তো যে তার মা নেই, তাহলে তিনি শতকাজ ফেলে তার কাছে ছুটে আস্তেন, আর দু'চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতো। সেই মা-হারা ভিখিরী যা চাইতো, তার ঢের বেশী তাকে দিতেন। মায়ের নামে তিনি এমনিতর মাতোয়ারা হয়ে উঠ্তেন।

কিন্তু শেষে তাঁরও একদিন কপাল ভাঙ্গ্লো। মায়ের নাম শুন্লে যিনি এমন করে গলে যেতেন, যে মাকে তিনি এত বেশী ভালবাস্তেন, যাঁকে তিনি দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর সেই মা একদিন তাঁকে একলা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তখন তাঁর যে কি দশা হোল, সে তো বুঝ্তেই পারছো। দিন-রাত 'মা' 'মা' বলে কেঁদে কেঁদে তাঁর দিন কাট্তো। তিনি কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে নির্জ্জনে বসে থাক্তেন। কারো সঙ্গে মিশ্তেন না। খাওয়া-দাওয়া তো এক রকম ছেড়েই দিলেন। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুতেন। ছাতা মাথায় দিতেন না। জুতো তো পরতেনই

না। শুধু যে মায়ের শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে ছিলেন, তা মনে করো না—পূরোপূরি একটি বছর তাঁর এই রকম করে কেটেছিল। মায়ের অভাবে তাঁর যে কি বেদনা, কি দুঃখ হয়েছিল, তা এতেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

এর পর পাঁচ-ছ' বছরের ভেতর তাঁর বাপও মারা গেলেন। তিনি তখন আরো কাতর হয়ে পড়লেন। মা গেলেন, বাবাও গেলেন—শরীর মন তাঁর একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। তারপর নানা রকম অসুখ-বিসুখ হোতে সুরু হোল। হঠাৎ আর এক বিপদ ঘট্‌লো। একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে টম্‌টম্ চড়ে যেতে যেতে রাস্তার মাঝে তিনি গাড়ী উল্টে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর পেটে এত ভয়ানক লেগেছিল যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। তারপর অনেকদিন ভুগে যদিও বা সেরে উঠ্‌লেন, কিন্তু আগের মতো কাজ-কর্ম্ম করবার ক্ষমতা আর তাঁর রইলো না। সেই থেকে কেবলই তিনি ব্যারামে ভুগ্‌তে লাগ্‌লেন। ব্যারাম ক্রমশঃ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। ভাল ভাল ডাক্তারেও কিছুতেই কিছু করতে পারলেন না। তারপর? তারপর যা ভাব্‌তে পারা যায় না, তাই হোল। শেষে একদিন, ছেলেমেয়েদের কাঁদিয়ে, ভাই-বন্ধুদের মায়া

কাটিয়ে, দেশকে অন্ধকার করে ৭১ বছর বয়সে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর স্বর্গে চলে গেলেন।

তিনি আজ বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাদের ভেতর অমর হয়ে আছে—আর চিরদিন তা থাক্‌বেও। তোমরা এতক্ষণ তাঁর জীবনকথা শুন্‌লে, কিন্তু শুধু শুন্‌লেই তো হবে না। কাজে ও কথায় তাঁর মতো হবার চেষ্টা করতে হবে। জীবনকে উন্নত করতে হোলে, মহতের আদর্শে জীবনকে গঠন করতে হয়। বিদ্যাসাগরের মতো মহৎ তোমরা আর কোথায় পাবে বলো? সামান্য অবস্থা থেকে মানুষ যে কত বড় হতে পারে, তিনিই তার প্রমাণ। আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ—

* * *

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার!
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার!

নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ অতুর অকিঞ্চনের সাধ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।

*   *   *

মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হবে,—চাই সে এমন বীর ।

*   *   *

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহ-শিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !

*   *   *

এই বীরশিশুর জীবনকে আদর্শ করে জ্ঞানে, কর্ম্মে, চরিত্রে তোমরা যদি বড় হয়ে উঠ্‌তে পার, তবেই তোমাদের এই জীবন-কথা শোনান সার্থক হবে ।